অমৃত বিষে

অলোক সরকার

ত্রয়ী ॥ কলকাতা

পরম পূজনীয়া

আমার ‘মা’

শ্রীমতী সুধারানী সরকার

শ্রীচরনেষু ॥

পাঠক পাঠিকার দরবারে

শুরুর আগে প্রসঙ্গতঃ দু একটা কথা বলে নিতে চাই। 'অমৃত-বিয়ে'র বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোন আলোকপাত কিংবা গুণব্যাখ্যানের প্রয়াস নয়। 'ব্লু-প্রিণ্ট' দেখে বাড়ীটা কেমন হবে, তা শুধু অভিজ্ঞ স্থপতিই বুঝবেন। তাই 'ভূমিকা'র খনেদী ইমারত ছেড়ে হাজির হতে চাই বাংলা সাহিত্যের রসপিপাসু 'পাঠক-পাঠিকার দরবারে'।

'নিজস্ব ফ্যাক্টরীতে প্রস্তুত স্বদেশী দিয়াশলাই' এর বিজ্ঞাপনের মত আত্মপ্রচারের জবরদস্তিতে না গিয়ে আমার মতে 'সৃষ্টি' নিজেই নিজের কথা বলুক। তাই দক্ষ স্থপতির আঁকা বাড়ী-তৈরীর নক্সাটা আপাততঃ টেবিলের শোভা হয়েই থাক্ঃ মুলতুবি থাক্ 'মূল্যায়নের' অমূল্য শুনানী। শুধু একটিবারের জন্যে নির্দ্বিধায় ঢুকে পড়ুন, টাট্কা রঙের গন্ধ ছড়ানো নতুন বাড়ীটির ছোট্ট অন্দরে, ঘুরেফিরে দেখে তৃপ্ত কিংবা বিরক্ত হ'ন।

গ্রন্থটি প্রকাশের ব্যাপারে আমি যাঁদের কাছে সর্বতোভাবে ঋণী, তাঁরা হলেন শ্রীযুক্ত তপনকুমার ঘোষ, ডাঃ নারায়ণ চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র সাঁতরা এবং ভ্রাতৃপ্রতিম্ বাপী, অমল ও বিমল।

গ্রন্থকার

গল্পক্রম

বেণী হালদারের বীক্ষণ ও বৃত্তান্ত

বলতে গেলে নয়ন একরকম আমাদের চোখের সামনেই বেড়ে উঠলো। উঠোনের লাউগাছটার মতো প্রথম দিকে ধীরগতি কঞ্চি-নির্ভর ক্ষীণাঙ্গী কৈশোর। কিন্তু তারপর একবার মাচার নাগাল্ পেলে আর তাকে পায় কে! ঢল্ঢলে সবুজ শরীরে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে চলা আর ছড়িয়ে পড়া। উঠোনের গাছ—রোজই দেখি, তাই তার বেড়ে ওঠার বহরটা ভাল করে খুঁটিয়ে দেখি না। বুড়ো অন্ধ ঠাকুরদার লাঠি ধরে দশ বছরে নয়নতারা বড় হলো, বেড়ে উঠলো চোখের সামনে। অথচ চোখের সামনেই ঘটছিলো বলেই হয়তো ব্যাপারটা তেমন চোখে পড়েনি।

বুড়ো বলে—"বউ-বেটার মাথা খেয়েছি, চোখের মাথাও খেয়েছি —সলতেট্কুন্ আছে। বাবুরা কিছু দয়া করেন।" পরিচিত এই কয়েকটি শব্দ সকালের অফিস-যাত্রীবোঝাই নটা-বাইশের কর্ড লাইন বর্ধমান লোকালে শুনে যদি কেউ এই দয়াপ্রার্থী অন্ধ ভিক্ষুক ও সলতেট্কু অর্থাৎ নাতনী নয়নতারার দিকে বিশেষ মনোযোগ দেন তাহলে বুঝতে হবে তিনি এ্যামেচার প্যাসেঞ্জার। আমাদের তাস এ্যাসোসিয়েশানের মেম্বাররা যখন বাহ্যজ্ঞানশূন্য, টু হার্ট-থ্রি স্পেড-ফোর ডায়মণ্ডস-এর জগতে তখন অবশ্য এই "বউ-বেটার মাথা খেয়েছি, চোখের মাথাও খেয়েছি, সলতেট্কুন্ আছে—বাবুরা কিছু দয়া করেন" —ইত্যাদি সংলাপ সিগন্যালের কাজ করে। বোস্দা বলেন, "সলতেট্কু উঠেছে। বাঁকিপুর এলো। দাও হে কান্তি, সিগারেট দাও।"

এই বাঁকিপুর নয়নতারাদের হোমস্টেশন। সকালের হাওড়াগামী এই নির্দিষ্ট ট্রেনটির প্রথম কম্পার্টমেণ্টে ওদের দেখা যাবে। তাস এ্যাসোসিয়েশানের হারা-জেতার ফাণ্ডের পয়সায় ফিল্টারটিপড্ উইলস্ কিং—সুতরাং ইউনিয়নের নিয়ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট স্টেশন এবং নির্দিষ্ট

সময়ের ব্যবধান ছাড়া তা দেবার নিয়ম নেই। অকশান ব্রীজের সাময়িক বিরতি—ননীদার পানের ডিবে বেরোয়। দত্ত নস্যির কৌটো ঠোকে আবার নিজের বরাদ্দ সিগারেটটা নিতেও হাত বাড়ায়। ইতিমধ্যে নয়নতারা ঠাকুরদার লাঠি ধরে আমাদের কাছাকাছি হাত বাড়িয়েছে। বোসদার রসিকতা,—"এই যে মা সলতে, দিন দিন ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছ কেন মা? আমরা যদ্দিন আছি তদ্দিন প্রদীপের তেল ফুরোনো চলবে না বাওয়া।" ইউনিয়ন থেকে ওদের রোজকার বরাদ্দ দশ পয়সা হাতে নিয়ে নয়নতারা চোখেমুখে এক মুঠো যুঁইফুলের মত মিষ্টি হাসি ছাড়ে আর বৃদ্ধের মুখে কয়েকটা এ্যাডিশ্যানাল কথা—"বাবুরা সব ভাল আছেন"—শোনা যায়। তারপর আবার টু হার্ট-থ্রি স্পেড আর ওদিকে 'বউ-বেটার মাথা, চোখের মাথা; সলতেটুকু আর বাবুদের দয়া' ইত্যাদি।

এই নিয়ে দশটা বছর কাটলো। কত পরিবর্তন হলো পৃথিবীর—আমাদেরও। নিক্‌শনের রাজ্যপাট গেল। 'বুমেরাং' নামক মারাত্মক অস্ত্রপরীক্ষায় সাংঘাতিকভাবে আহত হয়ে শোকে-দুঃখে ইন্দিরাজী 'নিজের খামারবাড়ী'তে মন দিলেন, বাংলার সুদর্শন 'মানুদা' পেশাদারী ক্রিকেটের ব্যাট্ হাতে তুলবেন, না শ্রদ্ধেয় দাদা-মশাই-এর সনাতন ব্যবসাপত্তর নাড়াচাড়া করবেন—বিবেচনা করছেন। বোসদা বাড়ী করে কোলকাতায় উঠে গেলেন। ননীদা রিটায়ার করে চাষবাস করেন। গতবার কাঠায় ছ'মণ করে উৎকৃষ্ট জাতের নৈনিতাল আলু ফলিয়ে আঞ্চলিক সম্মান লাভ করেছেন। দত্ত লটারীর টাকা পেয়ে চুটিয়ে মাল খাচ্ছে। শুধু আমার কথাই বলার নয়। কিছু শব্দ বগলে করে দুঃসাহসী ও ছন্নছাড়া জীবন কাটানোর দুঃসাহস আর নেই। ছুটির দরখাস্তে 'ক্লার্ক' বাদ দিয়ে লিখি 'এ্যাসিট্যান্ট' ইউ. ডি. এ্যাসিট্যান্ট। বিয়ে-থা করেছি—শ্বশুর মনোহর-পুরের কবিরাজ—বর্তমানে পশার নেই। ছেলে দুটোই পড়াশোনায় ভাল, কিন্তু কেরোসিনের অভাবে রাত্রে পড়তে পায় না।

"সময় থাকতে বিয়ে করে ভালই করেছ হে" সেক্শানের বড়বাবু শ্যামাপদদা বলেন—"চাকরী থাকতে থাকতেই ছেলেরা মানুষ হয়ে যাবে। বুড়ো বয়সে ওরাই দেখবে।" 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা' ফরমুলা আর কি! সংসারে নিত্যদিন অশান্তি। জায়ে জায়ে বনিবনা হচ্ছে না তাই বর্তমানে আমাদের ভায়ে ভায়ে তেমন সদ্ভাব নেই। এইসব সাত-সতেরো ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে গল্পের প্লট খোঁজা ছেড়ে দিয়েছি অনেক কাল। আজকাল সস্তায় শহরের দিকে খানিকটা প্লট খুঁজছি, পেয়ে গেলে কাঠাখানেক কিনে ফেলবো। বাড়ীর অশান্তি ঝামেলা আর পোষায় না। তেমন খোঁজখবর থাকলে জানাবেন তো।

ঠিকানা ঃ—শ্রী বেণীমাধব হালদার, গ্রাম—হাটখোলা, পোঃ—মৌরী, জেলা—বর্ধমান। অফিসের ফোন নম্বর ঃ ডবল টু ওয়ান সিক্স এইট্ ওয়ান, একস্‌টেনশান টু থ্রি। কর্ড লাইনের নটা-বাইশের বোনাফাইড্ প্যাসেঞ্জার। এখনও ট্রেনের একদম সামনের কামরায় চড়ার অভ্যেস রয়ে গেছে। আজকাল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে খোসগল্প করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। এক কথায় পাঁচ কথা এসে পড়ে। এই যে চোখের সামনে বেড়ে-ওঠা নয়নতারার কথা বলতে গিয়ে কেমন রামায়ণ ফেঁদে বসেছি! টাকার মত কথাও বাচ্চা পাড়ে। হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম—পরিবর্তনের কথা। তা পরিবর্তন তো কতই হলো—সব কি আর নজরে আসে, নাকি হিসেব রাখা যায়! আমাদের মত ছা-পোষারা আজকাল কে কার খবর রাখে? শুধু ঐ খবরের কাগজটুকু সম্বল। তাও ছত্রিশ পয়সার ধাক্কা—এক বাণ্ডিল কালো সুতোর বিড়ির খরচ। সুতরাং সহযাত্রী কোন মাননীয়ের (রোজ খবরের কাগজ কেনার ক্ষমতা রাখেন) কাছ থেকে কাঁচুমাচু হয়ে চেয়েচিন্তে এক-আধ পৃষ্ঠা গোগ্রাসে পড়ে ফেলা ছাড়া উপায় নেই। তাতেই অনেক হয়। যেমন, পরিকল্পনার রূপায়ণ ও ভারতীয় অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনের প্রয়োজনে আন্দোলন-ধর্মঘট ইত্যাদি কয়েক

বছর না করার জন্য ইন্দিরাজীর সাম্প্রতিক বক্তৃতা, গোলপার্কের রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউটের কাঁচ-ভাঙ্গা আন্দোলন ও মন্ত্রী গ্রেপ্তার, জয়প্রকাশের মাথায় লাঠি, বোয়িং হাইজ্যাক, ভালোবাসার ব্লো-হট নাটক বারবধূ, নিভিয়া কোল্ড ক্রিমের নতুন আলো-আঁধারী মডেল, সিউড়ীতে নকশালী তৎপরতা, নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজের যুগান্তকারী অস্ত্রোপচার 'ওভারি ট্রানসপ্ল্যানটেশান,' গঙ্গার জোয়ার-ভাটার সময়সূচী, সাপ্তাহিক রাশিফলে কর্কট রাশির জাতকের ধন-বৃদ্ধির সম্ভাবনা ইত্যাদি। এবার থামতেই হয়। কারশেডের 'হালুয়া' স্টেশন (হাওড়া ও লিলুয়ার মাঝে সিগন্যালের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা অধৈর্য যাত্রীদের দেওয়া নাম) পার হয়ে আমাদের ট্রেন এবার হাওড়ার ঐতিহাসিক স্টেশনঅঙ্গনে প্রবেশ করবে। কাগজের মালিক ভদ্রলোক ইতিমধ্যে বার তিনেক আমার দিকে তাকিয়েছেন। আমি দেখেও দেখিনি এমন ভান করে এতক্ষণ ঘাড় গুঁজে পড়ে যাচ্ছিলুম (বিয়েবাড়ীর নেমন্তন্নে পান ধরিয়ে দেওয়ার পরও লেডীকেনির রস্‌টস্ চাট্‌পোট্ করে জিভে তুলে নেওয়ার মত)। কিন্তু না, এবার থামতেই হয়। ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়েছেন এবং আপনারাও পুরোনো সব খবর পরিবেশনে বিরক্ত হচ্ছেন। ভাবছেন, বড় বেলাইনে মামদোবাজী চালাচ্ছি। নয়নতারার বড় হওয়ার প্রসঙ্গে দেশের এত সব পরিবর্তন ও খবরদারির সম্পর্ক কি! আছে মশাই, আছে। নেহাৎ ধান ভানতে শিবের গীত নয়। নয়নতারার বড় হওয়াটা তো এইসব ঘটনা ও পরিবর্তনের মধ্যেই। পশ্চাৎপট্ ছাড়া ছবি আঁকার কেরামতি শিখিনি। তাই পাঁচ কথা এসে পড়েছে। তাছাড়া এত ডামাডোলে কার মাথার ঠিক থাকে বলুন। এই যে পাক্কা বিয়াল্লিশ মিনিট লেটে ট্রেন এলো, এর কৈফিয়ৎ কে দেবে? ডেপুটি ডিরেক্টর নরসুন্দর হাজরার সাউণ্ড প্রুফ চেম্বারের হাজরে খাতায় লাল কালির ফাঁস এবং বড়বাবু শ্যামাপদদার কুতকুতে চোখের আণবিক শক্তিসম্পন্ন হাসিসহ মন্তব্য—"টিফিনটা একেবারে সেরে

নিয়ে, ধীরে সুস্থে, ঠাণ্ডা মাথায় কাজে বসাই আমার মতে বেণীবাবুর স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর—কি বলহে অমর” ইত্যাদি। অতএব এক ধরনের দাঁত বার-করা হাসি দিয়েই প্রতিহত করতে হয় এবং অফিসের কয়েক ঘণ্টা পকেটের রেস্ত এবং মাসের বাকী দিনের হিসেব ও সামঞ্জস্য বিধানের জট ছাড়াবার চিন্তায় কেটে যায়।

পরিবর্তন মানে তো একটা নতুন কিছু। আর সবকিছু যখন পরিবর্তিত হয়-ই তখন এই গোলমেলে এলোপাথাড়ি অবস্থাটারও তো একটা ফয়সালা হওয়া দরকার। ব্যাপারটা অনেক বছর ধরে চলছে, সুতরাং পাল্টাবেই। কিন্তু কে পাল্টাবে, কবে পাল্টাবে—সাত-সতেরো চিন্তায় মাঝখান দিয়ে রোজই কর্ড লাইন বর্ধমান লোকাল ছোটে, রোজই লেট করে, হাজরে খাতায় প্রায়ই লাল দাগ পড়ে। বেলানগরের বাঁকে ট্রেন থামিয়ে হাতে স্টীলের বালা পরা কয়েকটা ছোকরা বস্তা বস্তা চাল নামায়, পেট-কাপড়ের নীচে চালের পুঁটলী বাঁধা, তেল-না-জোটা রুক্ষ চুলের মেয়েগুলো হোম গার্ডদের সঙ্গে লুকোচুরী খেলে—ধরা পড়ে গর্ভপাত হয় কারও, টানাটানিতে কাপড় খুলে যায় কখনও—ব্লাউজ-পেটিকোট না থাকায় দৃশ্যটা স্বভাবতই উপভোগ্য হয় ভারতীয় আম্-জনতার কাছে!

কিন্তু এসবই নিত্য-নৈমিত্তিক। এখন আমার মাথায় অতিসাম্প্রতিক যে পরিবর্তনটা রীতিমত নাড়াচাড়া দিচ্ছে তা হল—বউ-বেটার মাথা খাওয়া, চোখের মাথা খাওয়া ও সলতেটুকুর অনুপস্থিতি। নটা-বাইশ বাঁকিপুর পার হয়ে যায়, ওরা আর ওঠে না। তা প্রায় মাসখানেক হতে চললো। প্রথম কদিন খেয়াল করিনি। দশ বছরের একটানা শব্দের গুঞ্জন হয়তো দৃশ্যবস্তুর অনুপস্থিতির ফাঁকটুকু সাময়িক ভরিয়ে রেখেছিলো। এর পর যত দিন যায় বাঁকিপুর এদের কথা মনে পড়িয়ে দেয়—ভাবায়। মনস্তত্ত্বে একেই বুঝি ‘অনুষঙ্গ’ বলে—সম সম্পর্কের একটি ব্যাপার আরেকটিকে মনে করিয়ে দেয়। তারপর চলে খুঁটিয়ে দেখা ও ভাবা। সত্যিই তো নয়নতারা এখন

আর সলতেটুকু নয়। বছর পার হয়েছে, ফ্রকের সাইজ বড় হয়েছে, কাঠি কাঠি হাত-পা-বুক পুরন্ত হয়েছে—মাচার নাগাল পেয়ে লাউ-গাছটা ঢল্‌ঢলে সবুজ শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে। এসব ভাবনা সম্প্রতি আমার মগজে ঘুরপাক খায়, আবার মিলিয়ে যায়। কিন্তু এর বেশী মোল্লা আর এগোয় না। কেন এগোবে? ট্রেনে ভিক্ষে করা বেওয়ারিশদের হদিস্ নেবার মত মাথা-ব্যথার মহম্মদ এই দুনিয়ায় কে আছে?

কিন্তু ঘটনাচক্রে হদিস্ একদিন মিলে গেল। কলেজে-পড়া ছোঁড়ারা সকালে একপেট ভাত সাঁটিয়ে রেল লাইনে বসে পড়েছে। ট্রেন লেটের প্রতিবাদ। খুশি হওয়ার বদলে মেজাজটা গেল বিগড়ে। এমন একটা কাণ্ডকারখানা হবে আগে জানলে গিন্নীর হাতের উপাদেয় এঁচড়ের ডান্‌লাটা কোনো রকমে নাকে-মুখে গুঁজে দৌড়-ঝাঁপ করে নটা-বাইশ ধরার কসরৎ করতে হোত না আর এই পাণ্ডববর্জিত বাঁকিপুরে আটকে পড়তেও হোত না। আসলে আমাদের মত লোকেরা ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধাটুকুই বেশী করে বুঝি। অবস্থার পরিবর্তন, ত্যাগ-স্বীকার ইত্যাদি নেহাৎই কথার কথা। সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে খান চারেক বিড়ি শেষ। শুনলাম আগের গাড়ীগুলো পরপর আটকে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং ঘণ্টা চার-পাঁচের মত নিশ্চিন্তে ঘুমোন বা যথেচ্ছ বেড়ানো চলতে পারে। তারপর বাড়ী ফেরা তো আছেই। ট্রেন থেকে নেমে এলাম। এক চিল্‌তে প্ল্যাটফরমের একধারে বাঁশবনের লাগোয়া তাড়ির দোকান—খেজুর পাতায় ছাওয়া, খাটিয়ায় বসা, খালি গায়ে গামছা কোমরে বাঁধা জনা কয়েক খরিদ্দার, মাঝখানে বড় বড় কলসীর মুখে সাদা ফেনা। অন্য দিকে খানিক দূরে পায়ে-চলা রাস্তায় লেবেল ক্রসিং-এর পাশে মালগাড়ির পরিত্যক্ত ওয়াগনের তৈরী টিকেট ঘর ও স্টেশন মাস্টারের কোয়ার্টার-সংলগ্ন চত্বরে চীনেগাঁদা-দোপাটি-বেগুন-বরবটির সযত্ন প্রয়াস। পায়চারী করতে করতে হঠাৎ, টিকেট ঘরের পাশে এক

কোণে বসে থাকা আমাদের গত দশ বছরের ট্রেন-পথের সহযাত্রী অন্ধ দাত্বর দেখা পাব ভাবতেই পারিনি। সামনে একখণ্ড কাপড়ের টুকরোয় ত্ব-চারটে পয়সা—ভিক্ষের বোঝাই যায়। পাশে সেই ত্রিভঙ্গ-মুরারি লাঠি। এক মাসের চাপা কৌতূহলের তাগিদে জোর কদমে এগিয়ে গিয়ে একসঙ্গে অনেক প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলাম—"কি দাত্ব, খবর কি? এখানে বসে কেন? নয়ন কোথায়? গাড়ীতে আসেন না কেন?"—ইত্যাদি।

"খবর আর কি বাবু, একরকম চলে যাচ্ছে"—অন্ধ চোখের কোটরে পরিচিতের আপ্যায়ন—"গাড়ীতে যাওয়া আর শরীলে সয় না, তাছাড়া নাতনী আমার ডাগর হয়েছে। আজকাল ভারী লজ্জা তার লোকের কাছে হাত পাততে।" যুক্তি ছাড়া পথ চলি না, তাই হিসেব মত প্রশ্ন করি। "তা তোমাদের চলে কি করে? এখানে বসে আর কপয়সা হয়?"

"তা আপনাদের মা বাবার আশীর্বাদে নয়ন আজকাল ত্ব-পয়সা ভালই কামাচ্ছে।"

বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে। সেই নয়নতারা উপায় করছে। দাত্বর সাহায্য ছাড়া একা-একাই—কেমন সে উপায়! আমার মনে বাস্তিলের অন্ধকার, গলায় শব্দ আসে না। অন্ধ দাত্বর ঠোঁট-নড়ার প্রতীক্ষায় মুহূর্ত গুণি নিঃশব্দে।

হল্লাগাড়ী, বিক্রমাদিত্য ও বারবনিতা

এইমাত্র C.P. মার্কা লোহার জালে ঘেরা কালো গাড়ীটায় ওদের নিয়ে আসা হয়েছে, কয়েকজন নারীপুরুষ বিভিন্ন বয়সের, সংক্ষিপ্ত-শারীরী-বিজ্ঞাপনে, উগ্র সাজগোজ করা কয়েকটা মেয়ে—বারবনিতা। হল্লাগাড়ীর পাল্লায় পড়ে ভরসন্ধ্যার বাজার নষ্ট হওয়ায় কিছুটা বিরক্তি ছাড়া যাদের মুখে কোনো রকম উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তা দেখা যাচ্ছে না, অন্ততঃ ওদের হাসি-কথা-চটুলতা এবং সপ্রতিভতা দেখে মনে হয় ব্যাপারটা তাদের একঘেয়ে জীবনে কিছু অর্থদণ্ডের বিনিময়ে একটু বৈচিত্র্য খুঁজে নেওয়া!

এরা বলে হল্লাগাড়ী, সার্থক নাম—আমার মনে হল। কে এই নামটা দিয়েছিল কে জানে! রাত নটার পর কুখ্যাত পাড়ায় এর হঠাৎ আবির্ভাব হয়। হল্লাগাড়ীর একস্‌পার্ট সহকারী চুণি সামন্ত, ওরা বলে খেঁাচড়, সামনে যাকে পায় তাকেই গাড়ীতে তুলে ফেলে চট্‌পট্, যেসব মেয়ে নিজের নিজের খুপরীতে পালাবার সময় পায় না তাদের পড়তে হয় সামন্তের কবলে, তাদের যে-কোন অঙ্গে বা প্রত্যঙ্গে সামন্তের হাত পড়ে খুব সহজভাবে, মুরগীহাটার ব্যাপারীদের মত। তারপর হল্লাগাড়ীর বেঞ্চে বসে-পড়া কিংবা কাঠের পাটাতনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করা, গুণতিতে অন্ততঃ পঁচিশ-ত্রিশ না হলে গাড়ী ছাড়বে না।

ধাক্কা দিয়ে গাড়ীতে জোর করে তোলার সময় আমি বলতে চেষ্টা করছিলাম যে, এ গাড়ীতে আমার এখন ওঠার কথা নয়, অন্ততঃ তেমন কোন কারণ নেই, সামন্ত রুল ঘুরিয়ে ধমক দিলে, 'শালা, যত মাগীবাজ, ধরা পড়লেই ভদ্দর লোক! এখানে ঝামেলা করলে এইস্যা হাঁকাব তখন বুঝবি। থানায় চল, যা বলার সেখানেই বলবি।' বুঝলাম এইটাই কানুন, বাঁদিকের বেঞ্চের কোণে একটু জায়গা পেয়ে

বসে পড়লাম। কালো গাড়ীর অন্ধকারে চোখদুটো অভ্যস্ত হবার পর ওদের দেখতে পেলাম। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় দমবন্ধ অবস্থা, চোখে জ্বালা ধরছিল, এরা সবাই এমনকি কয়েকটা মেয়েও বিড়ি ধরিয়ে মেজাজ করে টান দিচ্ছিল, অবস্থার সঙ্গে খাপ-খাওয়াবার তাগিদে আমিও পকেটে হাত দিলাম, একটাই সিগারেট ছিল, দেশলাইটা কোথায় ফেললাম কে জানে! ইতস্ততঃ করতে দেখে সামনে বসা মেয়েটি তার ঠোঁটের জ্বলন্ত বিড়িটা এগিয়ে দিল। সিগারেটটা ধরিয়ে বিড়িটা তাকে ফিরিয়ে দেবার সময় সে বলল 'নতুন বাবু মনে হয়, ঘড়ি-আংটি সব খুলে ফেলুন, নইলে বেজন্মার বাচ্ছারা তাল পেলে সব ঝেড়ে দেবে। ভয় পাবার কিছু নেই—চুরি তো করেননি বাবু। টাকা-পয়সা বেশী থাকলে সামন্তকে কানে কানে একটু জানালেই কাজ হয়ে যাবে—থানা থেকেই ছাড় পেয়ে যাবেন, নইলে রাতটুকু হাজতে কাটিয়ে কাল কোর্টে 'হুজুরের' সামনে দোষ স্বীকার করবেন—পাঁচ-দশ টাকা জরিমানা, তার পরই খালাস।' মেয়েটির কথায় অন্তরঙ্গতা ও সমবেদনার আভাষ। আমি এখন আসামী, আমার শিক্ষা-সম্মান-রুচি-বিবেক ওদের অখ্যাতি-অশিক্ষা ও দারিদ্র্যের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার। এটাই তো একটা দারুণ প্লট—একটা চমৎকার উপজীব্য বিষয়, আকর্ষণীয় কিছু লেখার এবং অনভিজ্ঞের কৌতূহল মেটাবার—এবার আমি পথ খুঁজে পেলাম, আকস্মিকভাবে বন্দী হবার উদ্বেগ ও উত্তেজনা কমে এল, মনের টেপ-রেকর্ডার চালিয়ে দিয়ে প্রস্তুত হয়ে আমার অপেক্ষা শুরু হল, ভাবলাম, হয়তো এবার আমার প্রকাশককে 'একটা নতুন স্বাদের' গল্প উপহার দিতে পারব।

ইতিমধ্যে গাড়ী প্রায় ভর্তি, চুণি সামন্ত একটা মাঝবয়েসী লোককে চুলের মুটি ধরে টানতে টানতে নিয়ে এসে পাছায় একটা লাথি কসিয়ে ভেতরে ঠেসে দিয়ে গাড়ীর পিছনের দরজাটা বন্ধ করে দিল। রাইফেলধারী একটা সেপাই আমাদের বিড়ি-সিগারেট নিভিয়ে

ফেলতে হুকুম করল রোমসম্রাটের প্রধান সেনাপতির ভঙ্গিতে। হল্লাগাড়ী চলতে শুরু করলো। রাস্তায় কতকগুলো ছোট ছোট বেওয়ারিশ ছেলে-মেয়ে হাততালি দিয়ে, নেচেকুঁদে আমাদের এই শুভযাত্রাকে (কিংবা অশুভ!) অভিনন্দন জানালো, এই বিচিত্র ধরনের ধরপাকড় তাদের কাছে লুকোচুরি কিংবা চোরপুলিস খেলার মত বেশ মজার এবং উত্তেজনাময়—আকর্ষণের, প্রায়ই এমন মজাদার দৃশ্য দেখে আনন্দ উপভোগ করতে তারা অভ্যস্ত তা বেশ বোঝা গেল। কুখ্যাত গলিপথ পার হয়ে আমাদের নিয়ে হল্লাগাড়ী রাজপথে পড়ল। গাদাগাদি দেহগুলোর এক বিজাতীয় ঘেমো এবং ঘোলাটে দুর্গন্ধ, বিড়ি-সিগারেটের দম-আটকানো ধোঁয়া, বিলাসিনীদের মুখের সস্তা স্নো-পাউডারের সুবাস, পেট্রোলের ঝাঁঝাল গন্ধ 'এনাসিন'-এর চেয়েও দ্রুত আমার মাথাধরা সারিয়ে দিয়ে মেজাজটা এমন সাফ্ করে দিল, যে অবস্থায় ছোটখাটো যে কোন ব্যাপারে আমার গবেষণা শুরু হয়ে যায় এবং তা থেকে যে কোন একটা ফর্মুলা বেরিয়ে আসেই, যেমন এই মুহূর্তে আমার গবেষণা এই 'হল্লাগাড়ী'র আকার আয়তন প্রভৃতি নির্মাণ-কৌশলের সাধারণ এবং অন্তর্নিহিত বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। লোহার জালে-ঘেরা গবাক্ষহীন পুলিসের এই গাড়ীগুলোর মজবুত সতর্কতা ছাড়াও আরও একটা ব্যাপার আছে। খুব কাছে এসে ভালোভাবে নিরীক্ষণ না করলে বাইরের কৌতূহলী দর্শকের পক্ষে ঘনজালের অভ্যন্তরে রহস্যময় ব্যক্তিদের চট্ করে সনাক্ত করা সম্ভব নয়। অপরাধী হলেও ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের নাগরিক হিসেবে ওদেরও তো একটা মানমর্যাদা আছে, তাছাড়া অনেক সময় নিরীহ-নিরপরাধ কিংবা দেশবরেণ্য মাননীয় ব্যক্তিদের এতে উঠতে হয়, তাঁদের মান-সম্মান বা আব্রু রক্ষার জন্যেই হয়তো এই ব্যবস্থা, অন্ততঃ এই মুহূর্তে আমার তাই মনে হল। সুতরাং ছাত্র কিংবা শিক্ষক, আত্মীয় কিংবা শুধুই পরিচিত, অফিসের বড়বাবু কিংবা সমগোত্রীয় সহকর্মী, পার্টি-লিডার কিংবা অনুগত পার্টিক্যাডার, পুত্র কিংবা পিতা, স্বামী কিংবা

প্রণয়ী—প্রত্যেকেই এমতাবস্থায় নিজেকে একটু আড়াল করতে চাইবেন এবং হল্লাগাড়ীর মজবুত লোহার জালের ঘন আবরণ তাঁদের সেই সুযোগটুকু দেবে। অবশ্য বিপরীত কাণ্ডকারখানাও দেখা যাবে। ঐতো ওপাশের বেঞ্চে উপবিষ্ট ছুই ছোকরা, মুখ-চোখ ও চেহারায় অবাঙ্গালীর স্পষ্ট ছাপ, মিঠামশলার পান চিবোতে চিবোতে কেমন খোস্‌মেজাজে গল্প করতে করতে বাইরের দিকে উঁকি-ঝুঁকি মেরে নিজেদের প্রকাশ করার চেষ্টা করতে তৎপর, যেন 'ক্যাপিটাল্ল একস্‌প্রেসের' রিজার্ভ কূপের ছুই সহযাত্রী প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগের আগ্রহে আকুল। পরনে আধময়লা ধুতি আর চক্‌চকে টেরিলিনের ফুলসার্ট। কলকাতায় পয়সা উড়ছে ওরা শুধু তা ধরে নিতেই জানে না 'দেশওয়ালী ভাই'দের মারফৎ সেই 'চিচিং ফাঁক' মন্ত্রগুপ্তি শিখে নিয়ে ওরাই এখন 'গোল্ডেন সিটি' এই কলকাতায় বিজয়ীর ভূমিকায় বহাল তবিয়তে বেঁচেবর্তে আছে। কিন্তু 'হররোজ রূপেয়া কামাই' করলেই তো চলবে না, 'দিল্'টাও তো 'খুশ' রাখতে হবে, তাই মাঝেমধ্যে, মোটামুটি 'রূপেয়া কামাই' হলে, এইরকম এক সন্ধ্যায় ছুই ইয়ারে 'দারু অউর আওরত্'—একটু স্ফূর্তির তাগিদে এ পাড়ায় ওদের আসা—পাকেচক্রে হল্লাগাড়ীর কবলে। ফোকটে সরকারী গাড়ী চেপে হাওয়া খাওয়া—এও কি কম বিলাস নাকি! ওদের ছুই ইয়ারকে বেশ সহজ ও সপ্রতিভ—অন্ততঃ আমার তাই মনে হল, এবং রাজভবনে কোন ভি. আই. পি.র গাড়ী প্রবেশ করার পর মাননীয় ব্যক্তিগণ যেভাবে নেমে আসেন, মুচীপাড়া থানার কম্পাউণ্ডে আমাদের কালো ডজ্ গাড়ীটা প্রবেশ করার পর ওদের মুখের ভাবটা ঠিক তেমনই মনে হল। বুঝলাম, ওরা অনেকদিনের অভিজ্ঞ 'ভি. আই. পি. অন সিনিয়র র‍্যাঙ্ক।'

ঘরভর্তি লোকজন। ফায়ার ব্রিগেড, অ্যামবুলেন্স এবং 'দিবারাত্র ফটো তোলা হয়' মার্কা স্টুডিওর মত থানা তথা নগরপালের অফিসও দিনরাত জমজমাট, বিশেষ করে রাতের প্রহরগুলো এখানে আরও

'বিচিত্র ও আকর্ষণীয়। হল্লাগাড়ীর যাত্রীদের মেয়েপুরুষ নির্বিশেষে, লাইন করে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে যেন 'ওয়ার ফিল্ডের একট্রুপ সৈনিক' আসন্ন লড়াইয়ের পূর্বে সর্বশেষ নির্দেশের অপেক্ষায় বিষণ্ণ-গম্ভীর। সামন্তর মুহুর্মুহু ধমক—'বাত্ চিত, নাকে কান্না একদম চলবে না, কড়া ডিসিপ্লিন। অবশ্য এর সবটুকু বাহাদুরী বা কৃতিত্ব 'ট্রুপ কমাণ্ডার' চুণি সামন্তের। লাইনের মাঝামাঝি আমার স্থান হয়েছে, কিন্তু বসার সুযোগ না থাকায় পিছনের একটা টেবিলের কোণায় দেহের ভার দিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার প্রস্তুতি নিয়েছি। একে একে ডাক হচ্ছে, মহারাজাধিরাজ 'বিক্রমাদিত্যে'র মত কর্তব্যরত সেকেণ্ড অফিসারের টেবিলের সামনে আসামীকে 'এ্যাটেনশান্' করতে হচ্ছে এবং পাশে দাঁড়িয়ে সামন্ত প্রচণ্ড স্মৃতিধর কম্পিউটারের মত আসামীকে কি অবস্থায় পাওয়া গেছে সেই বর্ণনা কেমনভাবে দিয়ে যাচ্ছে তার একটু নমুনা :

সামন্ত : স্যার, এর মুখে বাংলার গন্ধ পেয়েছি (জীবনানন্দ 'রূপসী বাঙলায়,' 'বাঙলার মুখ' দেখেছিলেন আর সামন্ত পেয়েছে বাঙলার গন্ধ, বাঙ্গালীর ছেলের মুখে বাঙলার গন্ধ, ভালই তো!) তারপর দেখুন স্যার, পাছাতেও কাদার দাগ রয়েছে।

বিক্রমাদিত্য : কি ব্যাপার হে, এ্যাঁ......মাল্ টেনে মাগী-পাড়ায় স্ফূর্তিটুর্তি, হাঃ হাঃ হাঃ—তা বেশ বেশ।

জনৈক বাঙালী যুবক : না স্যার, সত্যি বলছি...বিশ্বাস করুন...।
(তার কথা শেষ হবার আগেই)

বিক্রমাদিত্য : একেবারে সত্যপীর যুধিষ্ঠির এ্যাঁ, তবে কি ওখানে 'ইভিনিং ওয়াক্' করছিলে খোকনসোনা (তৎসহ একটা দারুণ খিস্তি)

তারপর গতানুগতিক এফ্. আই. আর. লেখা —নাম, বাবার নাম, ঠিকানা পেশা ইত্যাদি সাতসতেরো ব্যাপার সবশেষে,

বিক্রমাদিত্য : সামন্ত, পকেট দেখ—কত ? আট টাকা তেষট্টি পয়সা মাত্র ! সস্তায় ফুটানী (আবার খিস্তি), ঠিক আছে লক্ আপে দিয়ে দাও।

ধীরে ধীরে লাইন এগিয়ে যাচ্ছিল, কম্পিউটার কাজ করছিল, বিক্রমাদিত্যের বিচিত্র বিচার ও চমকে-দেওয়া খিস্তির মধ্য দিয়ে এক ঘণ্টা কেমন করে পার হয়ে গেল জানি না। এবার আমার পালা। কিন্তু কি আশ্চর্য! সামন্ত গড় গড় করে 'আমাকে কি জঘন্য অবস্থায়' তুলে আনা হয়েছে—আর একটা দারুণ বিশ্বাসযোগ্য বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টাকে থামিয়ে দিয়ে বিক্রমাদিত্য আমাকে তাঁর একস্‌রে দৃষ্টি দিয়ে কিছুক্ষণ জরিপ করে নিলেন, তারপর আবার আশ্চর্য—আমার বিষয়ে সওয়াল শুরু হোল 'আপনি' দিয়ে—যা আমি আশাই করিনি কেননা আমার চেহারা টেহারা মোটেই তেমন সম্ভ্রান্ত 'আপনি' পর্যায়ের নয়—নেহাৎ সাদামাটা ছাপোষা গেরস্ত বাঙ্গালী (আমার প্রতি সামন্তের 'মাগীবাজ' বিশেষণটি মনে পড়ল) সুতরাং 'পেটী ক্রিমিন্যাল' মনে না করার তা কোন কারণ নেই। কিন্তু হল্লাগাড়ীর এইসব মেয়ে পুরুষ, এদের ক্রিমিন্যাল বলা চলে কি! শুধু পোড়া পেটের তাগিদে এই পন্যা মেয়েগুলোর রঙ-মাখা মুখের কষ্টার্জিত হাসি, চটুলতা ও ছলনার পিছনে কতখানি বঞ্চনা ও কান্না লুকিয়ে আছে তার খবর তো আমরা প্রায় সকলেই কিছু না কিছু জানি। আর পতিতাবৃত্তি এখনও যেহেতু সরকারী আইনসিদ্ধ, তখন এইসব কামনাতাড়িত মানুষের পতিতালয়ে যাওয়া অপরাধ কেন এবং রাত নটা পর্যন্ত যা স্বাভাবিক, নটার পর তা কেমন করে অপরাধে রূপান্তরিত হয়, মানুষের প্রথম রিপুটির তাড়না ঘড়ির কাঁটার হিসেবে বর্ধিত কিংবা প্রশমিত হয় কিনা—এসব আমার মাথায় আসে না, হয়ত আমার বিদ্যেবুদ্ধির অভাব—এইসব আবোল তাবোল ভাবনার মাঝে কিছুটা আনমনা হয়েছিলাম, বিক্রমাদিত্যের গম্ভীর কণ্ঠস্বরে সম্বিৎ ফিরলো।

বিক্রমাদিত্য ঃ আপনার নামটা ?

আমি ঃ শ্রীঅতুল সান্যাল।

বিক্রমাদিত্য ঃ অতুল সান্যাল—নামটা চেনা চেনা লাগছে, দাঁড়ান, দাঁড়ান অ···তু···ল সা···ন্যা···ল, আচ্ছা আপনি কি বইটই লেখেন নাকি মশাই ? আমার মিসেস্ আবার সাহিত্যফাহিত্য নিয়ে খুব চর্চা করেন, ওঁর কাছে প্রায়ই শুনি কোন্ এক অতুল সান্যাল নাকি জবরদস্ত এক বিতর্কিত লেখক, দারুণ শক্ত কব্জিতে লিখে-টিখে থাকেন, কি একটা উপন্যাস···হ্যাঁ মনে পড়েছে 'ডালিম ফুলে বিষ' লিখে কোর্ট কেস্-ফেস্ হয়ে দারুণ পাবলিসিটি পেয়েছে !

মিঃ বিক্রমাদিত্য যখন জানতে পারলেন যে তাঁর মিসেস-এর প্রিয় সেই রগ্‌রগে লেখক অতুল সান্যাল এই অধম আমিই, তখন তাঁর চক্‌চকে্ মসৃণ মুখে 'স্কচ খাওয়া একগাল হাসি' ও আপ্যায়ন—

বিক্রমাদিত্য ঃ আরে বসুন বসুন, দেখুন তো কি কাণ্ড। আরে এই সামন্ত, শুয়ারের বাচ্চা (আদর করে) করেছ কি হে —কাকে ধরে এনেছ জান ?

সামন্ত ঃ (বিনীত কাঁচুমাচু স্বরে) অন্যায় হয়ে গেছে স্যার, বুঝতে পারিনি, উনি এমন জামাকাপড় পরে······।

মিনিট পাঁচেক আগেও আমার সম্পর্কে তার মন্তব্যের বমি অতি সহজে গিলে নিতে সামন্তের বেশী সময় লাগলো না। তারপর যথারীতি চা এলো, বিক্রমাদিত্য তাঁর 'ইণ্ডিয়া কিং' অফার করলেন এবং একদিন আমায় সশরীরে বালিগঞ্জের বাড়ীতে তাঁর মিসেস্‌কে একটা 'সারপ্রাইস্' দেওয়ার ব্যাপারে আমার সম্মতি আদায় করে তারপর জানালেন যে পুলিস, সাংবাদিক এবং ডাক্তারদের মত আমাদের, এই লেখকদেরও 'আইডেনটিটি কার্ড' ইস্যু করা দরকার, কারণ প্লটের খোঁজে আমাদের যখন 'অস্থানে কুস্থানে' প্রায়ই

যেতে হয়—তাঁর মুখে আবার সেই 'স্কচ খাওয়া একগাল চকচকে হাসি'।

পরিচিতি উন্মোচনের প্রভাবে আমার আপ্যায়ন ইত্যাদিতে বেশ কিছুটা সময় নষ্ট হলো। লাইনে আমার পরেও অনেকে বিক্রমাদিত্যের বিচারের অপেক্ষায়—আমি ও'দের দিকে চোখ ফেরালাম, দেখতে পেলাম সেই শ্যামলীকে—সেই পসারিণী মেয়েটিকে যে তার বিড়ির আগুন দিয়ে আমার মনের সিগারেটে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল, অন্তরঙ্গ সহানুভূতির দীপশিখার মিষ্টি আলোয় অভয় দিয়ে আমায় বলেছিল, 'ভয় পাবার কিছু নেই, চুরি তো আর করেননি বাবু…'। 'দোষ স্বীকার' করলে 'মুক্তি' পাওয়া যায়—ও'র বিশ্বাস ও চেতনার সেই সুরক্ষিত দুর্গের অভ্যন্তরে, এক কোণে আমিও একটু স্থান করে নিতে চাইলাম আর আমার হারানো বিশ্বাসগুলো ফিরে পেয়ে এই মুহূর্তে এক অদ্ভুত প্রশান্তিতে আমার বুক ভরে উঠলো।

ডিরেক্‌টার

ছেলেটা কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না। সারাটা পথ সমান তালে শোভার সঙ্গে হেঁটে চলেছে। শুরু সেই লালবাজার-বেন্টিং ক্রসিং-এ, তারপর বউবাজার স্ট্রীট ধরে সোজা পরপর সেণ্ট্রাল এভিনিউ-কলেজ স্ট্রীট-ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া পার হয়ে শিয়ালদায় কোলে মার্কেট পর্যন্ত অফিস ফেরৎ ভীড়ের সুযোগে নানাভাবে শোভার নজরে আসার এবং যে কোন ছুতোয় কথা বলার এবং বলানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কখনও পিছিয়ে পড়ে আবার পাশ কাটিয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায়, কখনও পাশাপাশি হাঁটার তালে শোভার হাতে একটু হাতের ছোঁয়া দেওয়া, যেন নিতান্তই অনিচ্ছাকৃত অন্যমনস্কতা অথবা ভীড়ের দোহাই। তবে রাস্তার লোকজনের কাছে যেমনই হোক, ব্যাপারটা যে সুবিধের নয়, ছেলেটার হাবভাবে তু'এক নজরেই শোভা কিছুটা বুঝতে পেরেছে। শোভারা এসব বুঝতে পারে অথবা বুঝতেই হয়। তা না হলে রাস্তায় বেরোনো চলে না। সে জানে, 'এ বড়ো কঠিন ঠাঁই সাবধানের মার নাই' তবে প্রতিবাদ চলবে না, তাতে আরো বিপদ। আজকাল সাধারণ লোকের সময় ও পয়সার বড় টান, এণ্টারটেনমেণ্টের তেমন সুযোগ নেই, তাই রাস্তায় তেমন কিছু ঘটলে মুহূর্তে লোকজন দাঁড়িয়ে পড়ে ভীড় জমে 'কি হয়েছে দাদা, মেয়েটার গায়ে হাত দিয়েছে, বলেন কি, ছাল ছাড়িয়ে নিন না, আরে থামেন তো মশাই দেখুন গে লটঘট কেস, দেনা-পাওনায় রফা হচ্ছে না তাই···হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ'—ইত্যাদি হতে বেশী সময় লাগে না। না বাবা, অত বীরত্বে কাজ নেই, ছেলেদের শিক্ষা দেবার জন্যে স্কুল কলেজ আছে। তার থেকে ট্ এ্যাভয়েড এণ্ড সলভ পলিশি অর্থাৎ চুপচাপ একদম পাত্তা না দেওয়া ওষুধে অনেক কাজ হয়, অন্ততঃ শোভার এ পর্যন্ত অভিজ্ঞতায় তাই মনে হয়।

এদিকে হিরো একেবারে নাছোড়বান্দা—রাস্তার সিগন্যালে দাঁড়িয়ে পড়তে পাশ থেকে মিনমিনে গলায় একবারতো বলেই ফেললো 'আপনাকে খুব চেনা চেনা লাগছে, কোথায় দেখেছি বলুন তো'—সেই মামুলি গদ, শোভা সোজাসুজি তাকালো, বিরক্তি-মেশানো ভ্রুকুটি যাকে বলা যায়। অনেক সময় এতেই কাজ হয়, অনেক হিরো এতেই নার্ভাস হয়ে ভীড়ে মিশে যায়, পিছিয়ে পড়ে কিংবা হনহন করে একদমে এগিয়ে যায় বা পালিয়ে যায়। আজকাল প্রায় সব হিন্দী সিনেমাতে দেখা প্রেম করার এই ধরনটা রপ্ত করতে গিয়ে আমাদের মধ্যবিত্ত হিরোরা কিন্তু রাস্তাঘাটে কোথাও হিন্দী বইয়ের মিল খুজে না পেয়ে ভড়্কে যায়, হদিস্ না পেয়ে দিশেহারা হয়ে ক্ষমা-টমা চেয়ে এসব লাইন ছেড়ে দিয়ে ভালোমানুষ হয়ে যায়, তারপর বিয়ে করার জন্যে পয়সা জমায়। শোভা দেখলো কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম-জমা একটা আগ্রহী মুখ অনেকখানি ঝুঁকি নেওয়ার উত্তেজনায় খানিকটা আরক্ত ও ভয়মেশানো সপ্রতিভতা। নেহাৎ বখাটে ধরনের র‍্যাগার মনে হলো না। তবে ভরসাও নেই, আজকাল মুখ দেখে মানুষ চেনা যায় নাকি !

ট্রাফিক পুলিস হাত নামিয়েছে, লক্‌গেট খুলে দেওয়া জলস্রোতের মত জনস্রোত ঝাঁপিয়ে পড়ে রাস্তা পার হয়ে চলেছে। অদ্ভুত এই তীব্র গতিস্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে এগিয়ে চলতে হবে, সময়মত অফিস পৌঁছোন যাবে আবার ফিরতি পথে ট্রেন ধরতে ঘড়ি-দেখা লাগবে না। থামলে চলবে না, তাহলেই অঘটন—ধাক্কা-ধাক্কি-বিরক্তি-সন্দেহ। শোভা পাঁচটা-বাহান্ন ধরবে। এই তাড়াহুড়োর সময় ছেলেটার রকমসকম দেখে তার গা-পিত্তি জ্বলতে থাকে। বাদুড়ঝোলা একটা ট্রামের পাশ দিয়ে সে চকিতে ফুটপাথ বদল করে অন্যদিকের জনস্রোতে মিশে গিয়ে বিশেষ একটি নজর এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে এবং জোর কদমে হাঁটতে থাকে। নিজের চতুর্সীমায় একনজর তাকিয়ে নিশ্চিন্ত হয়, 'না, পাতলা লম্বা চেহারার হলদে সোয়েটারকে

ধারকাছে দেখা যাচ্ছে না,' বোধহয় নিজেকে হিরোর-কবলমুক্ত করতে পেরেছে। কিছুক্ষণ চুপচাপ নিশ্চিন্তে হাঁটার সুবাদে তার এতক্ষণের বিরক্তি ভাবটা কেটে যাচ্ছিল। আর এইভাবে ফাঁকি দিতে পারায় সে মনে মনে একটু মজাও পাচ্ছিল, এমন সময় 'আপনি তো বেশ জোরে হাঁটেন ম্যাডাম' আবার সেই মিন্‌মিনে কণ্ঠস্বর। চম্‌কে বাঁ পাশে তাকিয়ে শোভা দেখতে পায় সেই 'হলুদ সোয়েটার' নাকি হলদে রঙের কিছু সর্ষেফুল! 'আপনার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা বেশ শক্ত ব্যাপার, যেন ওয়াকিং রেশ, তা হঠাৎ এ ফুটপাথে চলে এলেন কেন? আমি তো গুলিয়ে ফেলেছিলাম, আপনাকে খুঁজে পাচ্ছিলাম না। শুধু আকাশী রঙের চাদরটা দেখেইতো আবার আপনাকে ধরতে পারলাম, উঃ! ছুটিয়ে ঘাম বার করে দিয়েছেন।' কথার ধরন দেখ একবার। রাগ বিরক্তির বদলে এবার শোভার প্রচণ্ড হাসি পেয়ে গেল। কে যেন বাঁদরটাকে তার পিছনে ছুটে ঘাম বার করতে মাথায় দিব্যি দিয়েছে! কিন্তু হাসি পেলে কি হবে, হাসা চলবে না, ঘুমের একটা পেশীও যেন সংকুচিত না হয়। তাহলে আর রক্ষে আছে, প্রশ্রয় পেয়ে হয়তো প্রচণ্ড ইতরামি শুরু করে দেবে, তখন আর নিজেকে সামলানো যাবে না। প্রতিবাদ করতে হবে, ধমক্‌ধামক্‌ দিতে হতেও পারে, আর রাস্তার মাঝখানে সীন্‌ হলেই ভীড় জমবে, কি হয়েছে, কি বৃত্তান্ত—সাতসতেরো জবাব দাও, তারপর ক্যাবলা গাধাটাকে মারধোর-রক্তারক্তি এবং শেষ পর্যন্ত বিশজন সহানুভূতিপরায়ণ ভালোমানুষের প্রোটেক্‌শন নিয়ে স্টেশন পৌঁছানোর প্রস্তাব থেকে নিজেকে মুক্ত করার দায়ধাক্কা—সে এক বিশ্রী ব্যাপার। সুতরাং এ ক্ষেত্রে হাসার বিপদ সম্পর্কে সে ভীষণ সচেতন। তবে খানিকটা কৌতূহল তার মনে এবার উঁকি ঝুঁকি শুরু করছিল, ছেলেটার এই ধরনের আচরণ তার বেশ স্বাভাবিক মনে হলো না, অন্তত: এই হলুদ সোয়েটারকে সেই রকম রাস্তা-ঘোরা 'ধান্দাবাজ বি ক্লাস' মনে হলো না।

তা ছাড়া পাড়ার 'রকফেলার রোমিও'দের নিজ নিজ এলাকা

ছেড়ে কিংবা সিনেমা হাউসের ইভ্নিং শোর লাইন ছেড়ে ঠিক এই সময় এই অফিস ফেরৎ উর্ধ্বশ্বাস ঘেমো-জনতার দৌড়ের প্রতিযোগীতায় বড় একটা দেখা যায় না। বড় জোর ময়দানের ফুটবল-ভাঙ্গা-বিকালে ফেরার পথে ঝাঁকে ঝাঁকে এদের মাঝে পড়তে হয়, অনেক নাচাকোঁদা, শ্লীল-অশ্লীল হরেকরকম অঙ্গিভঙ্গী ও মন্তব্যের পাশ কাটিয়ে যেতে হয়, অবশ্য এসব ক্ষ্যামাঘেন্না করে দিতে হয়, কেননা ফুটবল খেলাতো আর রোজকার অফিস যাওয়ার মত ব্যাপার নয়, তাছাড়া রাতজেগে লাইন দিয়ে, রোদবৃষ্টি মাথায় করে তবেই খেলা দেখা, তারপর মোহনবাগান বা ইষ্টবেঙ্গলের হারা-জেতার প্রশ্নে উল্লাসে উন্মত্ত বা বিষাদে বীভৎস হয়ে মা ও ভগিনীদের স্মরণে না আসাই স্বাভাবিক—তাই ওসব দিনের ঘটনায় শোভা মাথা ঘামায় না বা কিছু মনে করবে না বলেই মনে মনে প্রস্তুত থাকে। কিন্তু আজকের এই 'হলুদ সোয়েটার' যেন এক ব্যতিক্রম—সাদামাঠা সাতাশ-আঠাশ মধ্যবিত্ত চেহারায়, আড়ষ্ট মিন্‌মিনে কণ্ঠস্বরে, ঘামজমা আগ্রহী মুখের পোট্রেট্‌কে কোন শ্রেণীভুক্ত করতে না পেরে শোভার কৌতূহল বাড়ছিল—'পাগল নয়তো!' শোভা ভাবনায় মোড় নিল। আজকাল নাকি অনেক 'সাইকো ক্লিনিক' খোলা হয়েছে যেখানে দলে দলে লোক মনের চিকিৎসা করতে ছুটছে যাদের মধ্যে অনেক ফাস-ট্রেটেড' তরুণ-তরুণী আছে যাদের বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায় না, পড়াশোনা করে, চাকরী করে, কবিতা লেখে, সংসার করে অথচ নাকি মনের দিক থেকে দেউলিয়া, পাগল আর মাতালদের শোভার বড় ভয়। সুস্থ মানুষের মুখোমুখী দাঁড়াবার, অন্যায়ের প্রতিবাদ করার মত মনের জোর তার আছে, অন্ততঃ সে নিজেকে এ পর্যন্ত সেইভাবেই চালিয়ে নিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে, টিউশানী করে ডিগ্রী কোর্সের বেড়া টপ্‌কেছে অনার্স রেখেই, কমপিটেটিভ্ পরীক্ষায় বসে যোগ্যতার অধিকারে সরকারী চাকরী আদায় করে স্বাবলম্বিনী হয়েছে এবং রিটায়ার্ড কেরানী পিতার ঘাড়ে কন্যাদায়ের দায়ীত্ব না চাপিয়ে

সংসারের দায়ীত্ব ঘাড়ে নিয়ে বেলঘরিয়ার ভাড়াবাড়ীর প্রতিবেশীদের ঈর্ষা ও সমীহ আদায় করেছে। এ পর্যন্ত কারও প্রেমে পড়েনি এবং পড়ার সুযোগও দেয়নি। জীবনের প্রকৃত মূল্যবোধ এবং আত্মসম্মানের ব্যাপারটা কেমন আশ্চর্যভাবে তার মনে গেঁথে যাওয়ায় শোভা কোন হট্‌কারী সিদ্ধান্তের ফাঁদে পা দিতে নারাজ। তবে একেবারে শুকনো 'দিদিমনি মার্কা' মনের চেহারা তার নয়। কয়েক বছরের প্রোটেকসন্‌ দিয়ে সংসারটাকে চালিয়ে নিয়ে বেকার ভাই-দুটোর কিছু হিল্লে হলে তখন অবসর মত সে নিজের চাওয়া পাওয়ার কথা ভাববে। তাই ঘড়ির কাঁটায় তার পথচলা—বড় হিসাবী ও সাবধানী।

কিন্তু আজ 'হলুদ সোয়েটার' তার অপ্রয়োজনীয় কৌতূহল বাড়িয়ে তুলছে। শোভার চেহারাটা সুঠাম বলা চললেও রঙতো তেমন উজ্জ্বল নয়, আবার পটলচেরা চোখ বা মেঘবরণ চুলও নয় যে রাস্তার লোকে একনজর তাকিয়ে দেখবে। অফিসের প্রতিমাদি অবশ্য শোভার গঠনের খুব তারিফ করেন, প্রতিমাদির মুখে কিছু আটকায় না, বলেন 'এমন ভরন্ত শরীরে না-কালো না-ফর্সা মাজামাজা উজ্জ্বলতা' নাকি ছেলেদের 'হট ফেবারিট'; হয়ত প্রতিমাদি একটু বাড়িয়েই বলেন, শোভা নিজেই জানে তার মুখচোখ এমন কিছু আহামরি নয় যাতে রাস্তায় তাকে দেখে রোমিওরা পাগল হয়ে ছোটাছুটি শুরু করে দিতে পারে। তাহলে আজ 'হলুদ সোয়েটার' কি দেখেছে যাতে তার এমন অশোভন কাঙ্গালপনা! যুক্তি ও প্রশ্নের সদুত্তর না পেয়ে শোভা অতএব নিয়ম ভাঙ্গলো এবং হলুদ সোয়েটারকে একটু সুযোগ দিয়ে ব্যাপারটা জেনে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়াটাকে সে তেমন কিছু দোষের মনে করল না। তাই শিয়ালদা স্টেশনে ঢোকার প্রাত্যহিক পথ বদল করে সে ঘুরপথে অপেক্ষাকৃত নির্জন ট্রাম-টারমিনাসে দাঁড়িয়ে থাকা জনহীন ট্রামগুলোর মাঝখান দিয়ে এগিয়ে চললো, গতি কমিয়ে দিল, হলুদ সোয়েটারকে কাছাকাছি হবার সুযোগ দিতে.

—শোনাই যাক না, কি বলতে চায়, যদিও এই জঘন্য নোংরা জায়গাটায় ঢুকে পড়ে তার বেশ খারাপ লাগছিল।

'আপনি এখান দিয়ে যাতায়াত করেন বুঝি, জায়গাটা নোংরা, দেখছেন না লোকজন যায় না' মিন্‌মিনে কণ্ঠস্বর বেজে উঠলো। আহা, কি বুদ্ধির বহর! গাধা আর কাকে বলে, আমি কোথায় মহাপুরুষকে সুযোগ দিতে যা কক্ষনো করিনি তাই করলাম—নোংরা প্রস্রাব-পায়খানার ডিপোতে এলাম আর উনি এখন উপদেশ বাক্যি ছাড়ছেন। শোভা এবার ঘুরে দাঁড়াল, 'ব্যাপার কি বলুন তো, সেই থেকে পিছু নিয়েছেন, কি যেন বলতে চাইছেন, বলুন তাড়াতাড়ি কি আপনার বলার আছে।' খালি ট্রামের মধ্যে খৈনী পাকাতে ব্যস্ত হাফপ্যাণ্ট-পরা একটা আধবুড়ো হিন্দুস্থানী ওদের দিকে তাকিয়ে 'কা হো কানাইয়া…' গান শুরু করলো, হয়তো ভাবলো 'মহব্বতকা সুরৎ' ইত্যাদি। আর এই রকম পরিস্থিতির মুখোমুখী কখনো হয়নি বলে স্বভাবতঃই ব্যাপারটা শোভার কেমন জঘন্য লাগছিল অথচ সেই মুহূর্তে তার করারও কিছু ছিলনা। 'না, এইরকম হটকারী কৌতূহল ভাল নয়, এমন আর কখনো নয়'। তাড়াতাড়ি উদ্ধার পাবার আশায় অসহিষ্ণুভাবে সে হলুদ সোয়েটারের মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ যেন আবিষ্কার করল সেখানে এতক্ষণের বোকামী বা অপটুতায় কোন চিহ্নই নেই, কি আশ্চর্য, যেন এক লহমায় আকাশের রঙ পাল্টে গেল, লম্বা ফর্সা, ছিপ্‌ছিপে চেহারায় হলুদ সোয়েটার গায়ে যে লোকটি তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে তার চোখে মুখে এখন যেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ছোটাছুটি! সজাগ চাতুর্যে চারপাশ এক পলকে দেখে নিয়ে অনুচ্চ অথচ স্পষ্টস্বরে শোভার জিজ্ঞাসু চোখে চোখ আট্‌কে দিয়ে প্রায় অনুরোধের সঙ্গে আদেশ মিশিয়ে সে বললো 'আপনাকে একটু উপকার করতে হবে। সেই থেকে আপনার পেছনে লেগেছি, বিরক্ত করছি কেন জানেন? আমার সঙ্গে প্রায় লাখ্‌খানেক টাকার মাল রয়েছে, দামী পাথরটাথর—চোরাই-বেআইনী-

বুঝতেই পারছেন। পুলিশের লোক পিছু নিয়েছে, মনে হচ্ছে এই স্টেশন এলাকাতেও জাল পেতেছে। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে এগুলো পাচার করতে হবে। ধরা পড়লে জান্ যাবে, কাজ হাসিল হলে দু একশো পাবো, বুঝতেই পারছেন এতেই সংসার চলে। আপনার সঙ্গে এতক্ষণ ফষ্টিনষ্টির অভিনয় করতে করতে এসেও শালাদের চোখে ধুলো দিতে পারিনি মনে হচ্ছে।'

শোভা একটা সত্যিকারের রোমাঞ্চ গল্পের মাঝখানে পড়ে এতক্ষণ হতভম্ব হয়ে পড়েছিল, এবার সম্বিত ফিরে পেলো এবং সেই সঙ্গে ভীষণ ভয়ের এবং দুর্ভাবনার একটা স্রোত তার মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে সিরসির করে বয়ে যেতে শুরু করলো। তার পা গুলো যেন আটকে গ্যাছে, মনে হলো যেন শত চেষ্টাতেও সে আর পা ফেলে এগিয়ে যেতে পারবে না। হলুদ সোয়েটার বুঝি সব বুঝতে পারলো, বললো, 'আপনি বোধহয় খুব ঘাবড়ে গ্যাছেন, আরে না না, এই মাল পাচার করে উপকার করার কথা বলে আপনাকে বিপদে ফেলবো না, আপনার কোন ভয় নেই। শুধু একটু অভিনয় করতে হবে যেটা মেয়েদের পক্ষে খুবই সহজ ও স্বাভাবিক। এখান থেকে বেরিয়ে স্টেশনে নতুন বিল্ডিংএ ঢোকার পথে আমি আপনাকে বিরক্ত করবো যেমন এতক্ষণ করছিলাম কিংবা এর থেকেও বাড়াবাড়ি। আপনি ঘুরে দাঁড়িয়ে 'ভদ্রমহিলার প্রতি অভদ্র আচরণের' শুধু একটু প্রতিবাদ, গালে চড়চাপড়, দরকারে পায়ের চটি চালালে আরও ভাল হয়। তাহলেই পাবলিক আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে আর ওদের মধ্যেই আমাদের দলের লোক থাকবে, পাবলিক্ হয়ে হম্বিতম্বি মারধোর করবে আর সেই ফাঁকে পুলিশের নাকের ডগা দিয়েই আমাদের মাল পাচার হয়ে যাবে।'

এতক্ষণে শোভা নিজেকে খানিকটা গুছিয়ে নিতে পেরেছে, বেআইনী কারবারের একটা বাজে লোক তাকে দিয়ে অন্যায় কাজ করিয়ে নিতে চাচ্ছে অর্থাৎ এক্সপ্লয়েট করছে। প্রচণ্ড ঘৃণায় তার ভয়-

ভাবনা সরে গেল, একটা দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে সে নিজেকে লোকটার কবলমুক্ত করতে চাইলো এবং প্রায় ছিট্‌কে ট্রামগুম্‌টি থেকে বেরিয়ে এসে স্টেশন চত্বরে জনতার ভীড়ে মিশে যেতে চাইলো। কিন্তু হলুদ সোয়েটার ছায়ার মত পাশে-পাশেই, শোনা গেল 'প্লীজ', শোভা বলল, 'না, ওসব নোংরা কাজ আমার দ্বারা হবে না।' হন্‌হন্ করে এক-নিঃশ্বাসে চত্বরটুকু পার হয়ে নতুন টিকেট্ কাউন্টারের পাশ কাটিয়ে সে প্লাটফর্মের সিঁড়িতে উঠতে যাবে এমন সময় ও'র বাঁ-হাতটা খপ্ করে আর একজনের হাতে বন্দী হয়ে গেল। চম্‌কে গিয়ে থেমে পড়তে হলো। আকাশের রঙ আবার বদল হয়েছে—আবার সেই কচিকাঁচা প্রেমিকপ্রেমিক-ক্যাবলাকান্ত মুখ, এবার সত্যিসত্যি হাজার লোকের সামনে তার গায়ে হাত দিয়েছে—এতখানি শোভা ভাবতে পারেনি। রাগে-উত্তেজনায় সে এবার ফেটে পড়ল, 'আপনার সাহস তো মন্দ নয়, ভেবেছেন কি আপনি, কোন সাহসে আপনি আমার হাত ধরেন, এক ঝাঁকানি দিয়ে শোভা হাতটাকে শয়তান লোকটার কবলমুক্ত করে রাগে যখন ফুঁসছে তখন তাদের চারদিকে লোক জমছে, ভীড় বাড়ছে এবং মানুষের একটা বৃত্ত তৈরী হয়েছে। চোখে-মুখে যথাসম্ভব অসহায়তা ও ক্যাবলামি ফুটিয়ে হলুদ সোয়েটার বললে, 'প্লীজ, রাগ করছ কেন, একটু কথা বলার ছিল তাইতো তোমায়···'

'তাই আপনি আমার হাত ধরবেন! আমি তো বলেছি, আমি পারবো না, ওসব আমার দ্বারা হবে না, তবু আপনি আমার পিছু ছাড়বেন না!'

'কি হয়েছে দিদি, ব্যাপারটা কি?' লম্বা চুল-জুল্‌পীর পাবলিক্ প্রতিনিধিরা সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসে।

'দেখুন না, লোকটা আমার পিছু নিয়েছে, যা তা বলছে, হাত ধরে অসভ্যতা করছে' রাগে-দুঃখে, অপমানের উত্তেজনায় প্রায় চিৎকার করে শোভা কথাগুলো বলতেই বারুদে আগুন লেগে গেল, শুরু হলো কিল-চড়-লাথি-ঘুঁষি, মুহূর্তের মধ্যে একঝাঁক মারমুখী মানুষের দলাপাকানো ঘূর্ণীতে হলুদ সোয়েটার ডুব দিল। জনতার আকর্ষণ ও

মনোযোগ যখন ঐ অসামাজিক জীবটির শাস্তিবিধানের সরলতম এবং বিনাপয়সার সহজ পদ্ধতির হুল্লোড়ের দিকে সেই সুযোগে শোভা কালবিলম্ব না করে ভীড় ঠেলে বেরিয়ে এসে তাড়াতাড়ি চার নং প্লাট-ফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা ব্যারাকপুর লোকালের একটা কম্পার্টমেণ্টে ঠেলাঠেলি করে উঠে পড়ল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ট্রেনটা ছেড়ে দিল।

প্রচণ্ড একটা উত্তেজনা থেকে সদ্য বেরিয়ে এসে শোভার মাথাটা ঝিম্‌ঝিম করছিল, শরীরটা ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়তে চাইছিল। এই শীতেরদিনেও গলা-বুক-পিঠ ঘামে ভিজে গেছে, ব্রেসিয়ারটা পিঠের দুপাশে চেপে বসে আছে—যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে। অথচ কম্পার্ট-মেণ্টেও ভীড়ের চাপাচাপি, নড়াচড়ারও অবকাশ নেই। চাদরটা খুলতে পারলে ভাল হত, এই মুহূর্তে শোভার নিজেকে সত্যি ভীষণ অসহায় মনে হচ্ছিল, যেন তার ভাবনা চিন্তাগুলো জট্ পাকিয়ে যাচ্ছিল। তবু সময় গড়িয়ে যায়, দমদম স্টেশনে কিছুটা খালি হওয়ায় শোভা গেটের কাছে এগিয়ে গেল এবং চলন্ত গাড়ীর ঠাণ্ডা বাতাস চোখেমুখে লাগতে এবার তার কিছুটা স্বস্তিবোধ হলো। সদ্য ঘটে যাওয়া নাটকীয় ঘটনাটা নিয়ে সে এবার নাড়াচাড়া শুরু করলো এবং ঘটনাটার শেষ পর্যায়ে এক জায়গায় তার ভাবনা হঠাৎ থেমে গেল। বিদ্যুচ্চমকের মত 'শেষদৃশ্যে তার নিখুঁত অভিনয়' আবার মনে পড়ায় সে নিজের মনেই এবার প্রবলভাবে হেসে ফেললো। আসলে শোভা তো অভিনয় করতে চায়নি, তাই তার অভিনয়টা অত নিখুঁত ও জীবন্ত হতে পেরেছিল। অবশ্য শিল্পীর থেকে যোলআনা কাজ আদায় করার সবটুকু কৃতিত্বই ডিরেক্টারের। জবরদস্ত ডিরেকটার সেই 'হলুদ সোয়েটার' এর ইচ্ছে ও নির্দেশ মত সব ঘটনাই ঠিক ঠিক নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, তাঁর সব পরিকল্পনা যেন একেবারে অঙ্কের মত নির্ভুল। সত্যজিৎ রায়- ফেলিনি-গদার-বার্গম্যানের পাশে 'হলুদ সোয়েটারকে' বসিয়ে গুণমুগ্ধ শোভা তার ডিরেকটারকে মনে মনে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে ট্রেন থেকে নেমে এল।

হুজুর, মুরগী মারা হয়েছে

তাড়ির ভাঁড় পাড়তে তালগাছে উঠে কানাবিজু তার শকুনির মত তীক্ষ্ণ এক চোখের দূরবীণ দিয়ে দেখতে পায় বাজমেলিয়ার মাঠ পার হয়ে 'লাল পাগড়ী' আসে এই গাঁয়ের দিকেই। গাছ থেকেই সে হাঁক দেয়, 'হেই-ই জগা, ভাটি লামা, সুমুন্দিরা আসে, কত্তারে খবর দে-এ-এ।'। বাঁশবনের আধো অন্ধকারে লতাপাতায় ছাওয়া মদ-চোলাই এর ভাঁটির আগুনে জল পড়ে, মুহূর্তের মধ্যে হাঁড়ি-কলসী-বোতল, চিটে গুড়ের টিন গোপন স্থানে পাচার হয়ে যায়। এদিকে তালগাছের গায়ে লাগান বাঁশের গাঁট বেয়ে তরতরিয়ে নামতে গিয়ে রোদ-লাগা পাকা তাড়ি কলসীর কানা টপ্‌কে চল্‌কে পড়ে কানাবিজুর হাঁটু ভিজে যায়। সে বিরক্ত হয়ে বলে 'শালা'। এই 'শালা' শব্দটা কানাবিজুর আনন্দ-মত্ততা-ক্রোধ-বিরক্তি-আদিখ্যেতা…সব-কিছুরই অভিব্যক্তি বলা যায়। তার অত সুন্দর বিজয় নামটা বদলে গিয়ে হয়েছে 'কানাবিজু', গাঁয়ের লোকে বলে 'নিশিকত্তার কুত্তা কানাবিজু।' তাড়াতাড়ি গোয়ালঘরের মাচায় ভাঁড় ঝুলিয়ে রেখে বনবাদাড়ের ভেতর দিয়ে, মনসাজলার কাদা মাড়িয়ে সংক্ষিপ্ত পথে খটাশের মত ক্ষিপ্রগতিতে কানাবিজু হালদার বাড়ীর দিকে এগিয়ে যায়।

এদিকে তখন নতুন পাকা কোঠার মস্ত উঠানের মাঝে ছোট্ট একটা টুলে বসে নিশিকত্তা তাঁর গৌরবরণ দশাশই চেহারায় ঘানি-মাড়া খাঁটি সরষের তেল মাখিয়ে আরামের রোদ খাওয়াচ্ছিলেন। কত্তার গলায় মাংশল-চর্বির খাঁজে সোনার চেন্‌টা কখনও অদৃশ্য হয়ে যায় কখনো রোদ্দুরে চিক্ চিক্ করে ওঠে। তাঁর মুখের সৌন্দর্য বর্ণনায় কানাবিজুর কথাগুলো নিশিকত্তার ভারী পছন্দ। একটু বেশী মাল টাল পেটে পড়লে বিজু বলে, 'কত্তার বিলিতি-খাওয়া বনেদী মুখ

যেন গোরা-সাহেবের মুখ—একেবারে দেবতাদের মত'। বস্তুতঃপক্ষে মহেশপুরের এই নিশিকান্ত হালদার অঢেল কাঁচা পয়সার দৌলতে বাঘে-গরুতে একঘাটে জলখাওয়াবার ক্ষমতা রাখেন। শুধু গাঁয়ের লোক কেন থানার বড়বাবু থেকে বি. ডি. ও. সাহেব পর্যন্ত তাকে রীতিমত সমীহ করে চলেন। নামে-বেনামে নয়নজলীর মাঠের প্রায় সব জমিই কত্তার কব্জায়—তা শ-পাঁচেক বিঘের কমতো নয়ই। গঞ্জে পাটের কারবার, মুদিখানা ছাড়াও আজকাল কানাবিজুর তত্ত্বাবধানে গোপন চোলাই মদের কারবারে বেশ দপ্ দপা। কত্তার কলকাতার বাড়ীতে মাসে মাসে মোটা টাকা যায়, ছেলেমেয়েরা সেখানে অভিজাত স্কুল কলেজে পড়ে, সিনেমা-সংস্কৃতি, গার্লফ্রেণ্ড, বয়ফ্রেণ্ড, ফ্যাশন, ক্রিকেট ইত্যাদি নিয়ে বড় হয়, মাঝে মাঝে ছুটিছাটায় গ্রামের বাড়ীতে পিক্‌নিকে যাওয়ার মত বেড়িয়ে যায়, আর সেই সময়টা নিশিকত্তার আঁট্‌সাঁট্ গড়নের প্রায় চল্লিশ-ছোঁয়া-যুবতী-খাস ঝি 'বিলাসী' ছুটি পেয়ে বোনঝির বাড়ীতে দিনকতক বেড়িয়ে আসে। স্ত্রী মারা যাওয়ার পর কত্তা আর বিয়ে করেননি আর তাঁর এই বৈরাগ্যের জন্যে কানাবিজু প্রায়ই আক্ষেপ করে।

এহেন কত্তাকে কোন খবর না দিয়ে পুলিশ আগে কেন? কানা বিজুর সাগরেদ জগা আর পেঁচোর কাছে বার্তা পেয়ে কর্তার ভ্রু কোঁচকায়, লালচোখ আরও লাল হয়, তেল চুক্‌চুকে গোঁফ নাচে—ভাববার আছে বৈকি। কদিন আগে 'প্রণামী' দিতে গিয়ে থানার বড়বাবুর কাছ থেকে দিন পনেরোর সময় পাওয়া গিয়েছে। এর মধ্যে কোন ঝামেলা হওয়ার কথা নয়। শ' তিনেক বস্তা ধান দালানেই মজুত। আজ রাত্তিরেই গাড়ী-বোঝাই হওয়ার কথা। কত্তা উঠে পড়েন, লুঙ্গীটা কোমরে টেনে বাঁধতে বাঁধতে বলেন, 'হ্যারে জগা, খবরটা ঠিক তো? কানা হারামীটা সকালেই মাল টেনে গাছে ওঠেনি তো?' সবেমাত্র উঠোনে ঢুকে কানাবিজুই জবাবটা দেয়, 'মাল টানলে কানার লজর আরও পোস্কার (পরিষ্কার) হয়, তা কি লতুন কথা? কিন্তুন্

ব্যাপারডা তো বুইঝলাম না—আড়কাঠি এল না, পুলিশ এল—এ ভাল কথা লয় কত্তা'।

ব্যাপারটা যে ভাল নয় তা মিনিট পনেরোর মধ্যেই বোঝা যায়। গাঁয়ের প্রবেশ পথের আশেপাশে প্রায়-শুকনো উদোর নালার জল ছেঁচে জলার মাছ, শামুক-গুগলী সংগ্রহে ব্যস্ত চাষাভুষোদের একঝাঁক নেংটা, হাফনেংটা, কাদাজল, পাঁকমাখা ছেনাপোনা, পুলিশ-সেপাই-বন্দুক দেখে থমকে ড্যাবডেবে চোখে চেয়ে থাকে তারপর পড়িমরি ছুট—মুহূর্তে গ্রামের অকুলীন মানুষদের ঘরে ঘরে খবর পৌঁছে যায় এবং নিরুপায় মহেশপুরের নিরীহ জনতা নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে হালদার বাড়ীর দিকে জুল্‌জুল্ করে চেয়ে থাকে। হারু মোড়ল সবাইকে সাবধান করে দেয় 'কেউ উদিকে যাবিনি, বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা আর পুলিশে ছুঁলে জেলে পা—খবরদার।' ওদিকে সদর থেকে পাঠানো' ধানচাল-সংগ্রহ-অভিযানের স্পেশাল ফোর্স' হালদার বাড়ীর চতুর্দিক ঘিরে ফ্যালে। গোপন খবর পেয়ে সি. আই. সাহেব নিজে অভিযানে এসেছেন, অবশ্য থানার বড়বাবু মহিম ঘোষালও সঙ্গে আছেন। বিপদে ঘাবড়াবার পাত্র নিশি হালদার নয় বরং এইরকম পাকেচক্রে তাঁর মাথা ভীষণ সাফ্ কাজ করে—সপারিষদ-সবিনয়ে এবং হাসিমুখে সি. আই. সাহেবকে অভ্যর্থনা করেন, 'আসুন স্যার, আসুন, আজ আমার কি ভাগ্য! মহামান্য সাহেবদের পায়ের ধূলোয় আমার গরীবখানা আজ ধন্য হল।' নতুন কলি করা সাজানো বৈঠক-খানায় সাহেবদের বসানো হয়। সি. আই. সাহেব ডাইরেক্ট-রিক্রুটেড্ ছোকরা-টগ্‌বগে, তেজী মানুষ—তখনই তল্লাসীর কাজ সুরু করতে চান। 'তা কি হয় স্যার, আপনারা এতদূর কষ্ট করে তেতেপুড়ে এলেন আর এই অধম একটু সেবা করতে পাবে না! মনে বড় আঘাত পাবো স্যার। তাছাড়া তাড়াহুড়োর কি আছে? সেপাইরা বাড়ী ঘিরে আছে, যা থাকবার তা তো বাড়ীতেই থাকবে, যাবে আর কোথায়? গাঁয়ের লোক আমরা, ধম্ম-অধম্মের ভয় আছে। গৃহে

অতিথি-নারায়ণ-সৎকার না করলে অকল্যাণ হবে স্যার।' সাহেবের অভিজ্ঞতা কম তাই কথাটা অযৌক্তিক মনে না হওয়ায় খানিকটা নরম হন। সুযোগ বুঝে দারোগা মহিম ঘোষালও টোপ্ ছাড়লেন, সাহেবের কানের কাছে মুখ এনে চুপিচুপি বললেন 'গ্রামের মানুষদের সংস্কার-টংস্কার গুলোকে একটু 'ইন্‌ডাল্‌জেন্স' দিলে ভাল কাজ পাওয়া যায় স্যার।' সুতরাং প্রশ্রয় একটু দিতেই হয়, সরবৎ দিয়ে শুরু, তারপর হাঁড়িভর্তি রসগোল্লা দিয়ে জলযোগ, চা-পান-সিগারেট্ ইত্যাদিতে এক ঘণ্টা পার হয়ে যায়।

ওদিকে ওস্তাদ কানাবিজুর দক্ষ সহকর্মীরা দালানের একপাশে কাঠের পাটাতন সরিয়ে মাটির নীচে নতুন তৈরী চোরাগুদামে মিনিটে চারখানা করে বস্তা ঝুপ্‌ঝাপ্ ফেলে দিয়ে তিনশো ধানের বস্তার একটি শূন্য কমিয়ে দেয়। তারপর পাটাতনের মুখ বন্ধ করে ত্রিপল চাপা দিয়ে তার উপর বস্তা তিরিশেক ধান লাট্ দিয়ে সাজিয়ে কপালের ঘাম মুছে কানাবিজু বৈঠকখানায় গিয়ে নিশিকত্তাকে বলে 'হুজুর, মুরগী মারা হয়েছে।' কোর্ডে 'অল ক্লিয়ার' খবর পেয়ে নিশি কত্তার ভেতরটা খুশীতে ডগ্‌মগ্ হয়ে যায়, কিন্তু বাইরে তা প্রকাশ পায় না, বলেন, 'পাঁঠাও মার একটা, আর সবদিকে নজর রাখ, সাহেবদের সেবা যত্নের যেন কোনরকম ত্রুটি না হয়।' বৈঠকখানার শিলিংএ ঝোলান দড়িটানা পাখার হাওয়ার আরামে এবং নিশি হালদারের আতিথ্যে মুগ্ধ সি. আই. সাহেব তখন কিঞ্চিৎ ঠাণ্ডা হয়ে পড়েছেন। একসময় আসল কথা ওঠে অর্থাৎ নিশি হালদারের লেভী ফাঁকি দেওয়া এবং বে-আইনী মজুতের অভিযোগ। কৃতাঞ্জলী-পুটে কত্তা বলেন, 'বেয়াদপি মাফ্ করবেন স্যার, লেভী ফাঁকি দেওয়ার মতলব আমার নেই, শুধু সময়ের অভাবে পাঠিয়ে দিতে খানিক দেরী হয়ে গ্যাছে। একা মানুষ, সবদিক সামলাতে পারি না। তাছাড়া কোল্ডস্টোরে আলু ভর্তির সিজিন্ চলছে, গরুর গাড়ীগুলো ওদিকেই আট্‌কে রয়েছে। আসল কথা হলো, উদয়াস্ত পরিশ্রম করে দু'পয়সা

রোজগার করছি, গাঁয়ের লোকের এটা সহ্য হচ্ছে না। এবছর ফসল তো তেমন হয়নি, তবু সরকারের লেভির ধান আমি 'রেডি' করেই রেখেছি, শুধু পাঠিয়ে দেওয়ার অপেক্ষায়। চলুন স্যার, নিজের চোখেই দেখবেন চলুন।' অতঃপর হালদার বাড়ীর উঠোনের লোক-দেখানো মরাইগুলোর কিউবিক ফুটের হিসাব কষে, মজুতধানের মোটামুটি একটা পরিমাণ বুঝে নিয়ে এবং দালানের বস্তাগুলোতে নম্বর লট্‌কে গাড়ী বোঝাই-এর জরুরী অর্ডার দিয়ে সি. আই. সাহেব বিজয়গর্বে, নিশি হালদারের মুরগী ও পাঁটার আমন্ত্রণ উপেক্ষা করে, সদলবলে সদরে ফিরে যান।

সেদিন রাত্রের 'ম্যায়ফিলে' কানাবিজুর গ্লাসে নিশিকত্তা নিজের হাতে 'বিলিতি' ঢেলে ছ্যান্। একসময় স্ফূর্তি বাড়ে, নেশা জমে ওঠে, কানাবিজুর জিভে কথা জড়িয়ে যায়। মুরগীর রাঙ্ চিবোতে চিবোতে সে বলে, 'আমি শালা কানাবিজু···নিশিকত্তার কুত্তা, এ গাঁয়ের কোন্ মুরুব্বির-পোর পেছনে তেল হয়, সদরে খবর দেয়···তালাস্ করে তার লাসে মাছি বসাবো···দেখে লেবেন কত্তা।' নতুন বোতলের ছিপি খুলতে খুলতে নিশি হালদারের টস্‌টসে মুখে সস্নেহ-প্রশয়ের হাসি ফোটে, আদর করে তিনি বলেন, 'এরই মধ্যে হারামীটার নেশা হয়ে গ্যাছে! হেঁ-হেঁ-হেঁ বাবা, হজম করা সোজা কথা নয়···এর নাম বিলেতী।' কর্তার সুশ্রী সবল পায়ে হাত বুলিয়ে সুড়সুড়ি দিতে দিতে কানাবিজুর গলায় আদুরে বুলডগের মত এক ধরনের 'গর-র-গর-র-র' শব্দ হতে থাকে, নেশার ঝোঁকে হয়ত নিজের কেরামতির কথাটা আর একবার তার মনে পড়ে যায়, বলে, 'হুজুর, মুরগী মারা হয়েছে।' তার-পর, 'হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ'···নিশিহালদারের ভরাট গলার গম্‌গমে হাসির সঙ্গে কানাবিজুর মিক্‌মিকে হাসির ভাঙ্গাচোরা শব্দ মিলে-মিশে হালদারবাড়ীর নতুন দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে রাতের অন্ধকারে ছড়িয়ে পড়তে থাকে, বুনো পায়রারা হঠাৎ ডানা ঝট্‌পট্ করে ওঠে। নিশিহালদারের হাসিতে ওদেরও গা ছম্‌ছম্ করে নাকি, কে জানে!

স্তুপমেঘ-স্তরমেঘ

মিতু কাঁদছিল—অনেকক্ষণ ধরে আমার পিঠে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদছিল। মিতুর ফোঁটা ফোঁটা চোখের জল, চুলের রাশি আমার পিঠে—আমি অনেকক্ষণ ধরে অনুভবে পাচ্ছিলাম। আমি উপুড় হয়ে শুয়ে হাতদুটো আড়াআড়ি ভাঁজ করে মাথা রেখেছিলাম। কিছু দেখছিলাম না, মুখ গুঁজে ছিলাম একান্ত নিজস্ব ভঙ্গিতেই। আমি কথা কইনি একটাও। এসব পরিস্থিতিতে স্বভাবতঃই আমি চুপচাপ থাকি। শুধু মিতু কাঁদছিল—মিতু, মিতালি, আমার স্ত্রী, আমার গত তিন বছরের একান্ত আপনজন, সুখদুঃখের শরিক। আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম মিতুর ধপ্‌ধপে ফরসা মুখখানায় কে যেন হালকা করে আবির মাখিয়ে কৌতুক করছে। সুখদুঃখের যে কোন উত্তেজনায় মিতুর মুখটা মোটামুটি এই রকমই দাঁড়ায়। মিতুর ছোট্ট কপাল, অদ্ভুত সুন্দর চোখদুটো আর চিবুকের পাশের ছোট্ট তিল্‌টার কথা আমি এই মুহূর্তে ভাবছিলাম। দুঃখের কিংবা শোকের ব্যাপারগুলো বেশ তারিয়ে তারিয়ে, বেশ রয়ে রয়ে অনেকক্ষণ ধরে উপভোগ করা চলে। মিতুর সব কিছুর অংশীদার আমি, কিন্তু এই মুহূর্তে সে তার কান্নার ভাগ আমায় কিছুতেই দেবে না—সান্ত্বনা দিলে আরও ঝাঁকিয়ে কাঁদবে—কান্নায় ভেঙ্গে পড়বে—আমি আরও বিব্রত হয়ে পড়ব। কেননা আমি কাঁদতে জানি না—আমার কান্না আসে না। পাঁচজনের শোক, বিলাপ, চোখের জল আমার চোখের ঢাক্‌নিগুলোর প্রান্তও স্পর্শ করে না বরং আরও নিষ্ক্রীয় করে তোলে।

বছর পাঁচেক আগের বাবার মৃত্যুর দিনটা বেশ মনে পড়ে। অফিসে ছোট কাকার টেলিফোন পেলুম—

হ্যালো, কে দীপু? আমি ছোটো কাকা বলছি। মেজদার আবার ষ্ট্রোক হয়েছে। এক্ষুনি বাড়ি চলে আয়।

আমি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ধরে নিয়েছিলুম যে বাবা গত হয়েছেন। মরে যাওয়ার ব্যাপারে এরকম একটু আধটু বুঝে ফেলা, অনেকেই পারে। কিন্তু আমি সমস্যায় পড়লুম। ভিজিটার্স রুমের এককোণে বসে ভাবছিলাম, কেমন করে বাড়ি ফিরব। কিন্তু এখনই আমি ফিরব অন্ততঃ ফিরতে হবেই। বাবা মারা গেছেন, কিংবা হয়তো শেষ অবস্থায়। বাড়ীর সকলে কাঁদছে (প্রথমটা সত্যি হলে), কিংবা খুব গম্ভীর অথচ মনমরা ভাব। আমি যেন স্পষ্ট—ছবিগুলো দেখতে পাচ্ছিলাম। অথচ আমি তখনও বসে বসেছিলাম। এই রকম পরিস্থিতিতে আমার নিজেকে খুনী আসামীর চেয়েও অপরাধী বলে মনে হয়। আমি কারও মুখের দিকে চাইতে পারি না—কেননা আমার চোখে হাজার দুঃখও ছায়া ফেলতে পারে না। এমনকি অতি শোকের জলে একটা কাঁচুমাচু ভাবও দেখতে পারি না—যেমন শ্রাদ্ধের নেমন্তন্ন পাবার আশায় হা ঘরের দূর সম্পর্কের আত্মীয়রা মরার খবর পাবার পরেই ছুটে আসে আর শোকের কাচুমাচু ভাব করে। অথচ আমি একটা পাষণ্ড হৃদয়হীন নই। ছোট বেলাতে একটা মুরগীও জবাই করেছি বলে মনে পড়ে না। পিতৃমাতৃহীনদের স্নেহমমতা নাকি একটু কম থাকে। আমি ছোটবেলা থেকে মা বাবার আদরে ভাই বোনদের সঙ্গে মানুষ হয়েছি আর বড় হয়ে কোন অসৎ সঙ্গে মিশেছি, মনে হয় না। সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে হৃদয় আমার আছে কিন্তু উত্তাপ নেই—সুখদুঃখের প্রকাশ সোচ্চার নয়।

বাবা মারা গেছেন—বাড়ী ফিরতে হবে—কেমন করে এখন বাড়ী যাব—মনে মনে ভাবছি আর অফিস থেকে পার্ক আর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে সন্ধ্যাবেলায় কোনরকমে বাড়ি পৌছে দেখি শবযাত্রার আয়োজন সম্পূর্ণ, শুধু আমার অপেক্ষায়। ইতিমধ্যে ছোট কাকা দুবার অফিসে খোঁজ নিয়ে এসেছেন। যাই হোক, কাকাকে সামনে পেয়েই পা

জড়িয়ে ধরে বলেছিলাম,—'আমাকে বাদ দাও ছোটকাকা। আমি কোথাও যেতে টেতে পারব না।' ছোটকাকা ভেবেছিলেন এবুঝি আমার গভীর পিতৃশোকের অপ্রকৃতস্থতা। তিনি আমায় বুকে জড়িয়ে হু হু করে কেঁদে ফেলেছিলেন। শবযাত্রায় কে কে ছিল কিংবা পিতার দেহ কেমন করে পুড়ল ; তা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়—কেননা ঐ পরিস্থিতিতে কারও মুখের দিকে চাওয়া বা কিছু দেখা আমার স্বভাবে আসে না।

এই যে মিতু কাঁদছে, অথচ আমি নির্বিকার। মিতুকে আমি আমার অবিচ্ছেত্ত অংশ হিসেবে মনে করি অথচ ওর কান্না আমাতে সংক্রামিত হবে না কিছুতেই। আমি আশ্চর্য হতাম আমারই সহোদরা অর্চনাকে যখন তখন কাঁদতে দেখে। ও বোধহয় আমার থেকে বছর চারেকের ছোট হবে। মনে পড়ে, আমাদের বাড়ীর মিনি বেড়ালটাকে যার পিঠে ঘিয়ে রঙের ছোপ-ছোপ—লোম ছিল। বদমাশটা ছাদের আল্‌সেতে ঘুরে বেড়াতে ভালবাসত আর অর্চনা হাউমাউ করে কাঁদত তাই দেখে। শুধু অর্চনার কান্না থামতেই আমি বেড়ালটাকে তাড়া দিয়ে নীচে নামাতাম। অর্চনার বিয়ে হয়েছে। স্বামী বহরমপুর কলেজের প্রফেশার। অর্চনার সঙ্গে একই কলেজে পড়ত আর আমার ভগ্নিটির কান্নাছলছল্ চোখ তুটি দেখেই নাকি ভদ্রলোকের ওকে পছন্দ হয়ে যায়। আমি ভেবেই পাই না মানুষ কান্নাকে এত ভালবাসে কেন! কান্নার জন্মই কি কান্নাকে এত ভালবাসা? কান্না কি একটা বিলাস? কান্নার বিলাসে মিতু ব্যস্ত, আমার প্রফেসার ভগ্নীপতি কান্নাচিক্‌চিক্ চোখের অনুরাগী—এ কেমন বিলাস!

মিতু কাঁদছে, আমার পিঠে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে, আমি উপুড় হয়ে হাত তুটো আড়াআড়ি রেখে মাথা গুঁজে থাকি ও'র রাজ্যের কান্নার হাল ধরে। ও'র লাবণ্য নদীর নাবিক হয়ে। ভাবনায় নিঃশব্দে দাঁড় টেনে চলি, ফিরে যাই আজকের বিষণ্ণ পট-ভূমির গোমতী-অপরাহ্নে। শেষ-বিকালের ছায়াটুকু তখন নেমে

এসেছিল। আমি মিতুর আগে আগে হেঁটে চলেছি। প্লাটফর্মের কিনারা ছাড়িয়ে রেল-লাইনের পাশে পায়ে-চলা পথটুকু আনমনা ছিলাম। মিতু স্তব্ধ অনুসরণকারিণী, দূরে মালগাড়ীর সান্টিং-এর শব্দ। অভ্যস্ত পথে চলছিলাম ওর হাত ধরে। রাঙচিতার বেড়ার পাশ দিয়ে যাবার সময় সন্ধ্যার ম্লান আলোয় 'বে-শরম্' ফিঙে জোড়ার নাচা-নাচি বেশ লাগছিল। মিতু ম্রিয়মাণ, চোখে তার কান্নার কাজল—ডাক্তার বসাক, বলেছেন সে কোনদিন 'মা' হতে পারবে না।

রাত অনেক হল, মিতু বুঝি ঘুমিয়েছে! আমি মুখ তুলি না, ভয় হয় পাছে আমার কান্নাহীন চোখে তার চোখ পড়ে যায়।

———

কারিগর

রমলা জানত সন্দীপ আসবেই। শুধু আসবে না, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দৌড়ঝাঁপ করে সমস্ত মিছিল কনডাক্ট করবে, শ্লোগান দেবে বক্তৃতা করবে। মিছিল যেন তার প্রাণ। রমলা তার কাছ থেকেই ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের প্রথম পাঠ নিয়েছে। জেনেছে লড়াই না করে বাঁচার দাবী আদায় করা যায় না। রমলার পোড়া-কপাল—বছর দুয়েক হল স্বামী হারিয়েছে। স্বামী হারিয়ে পেয়েছে এই চাকরী, সরকারী চাকরী, স্বামীর অফিসে, সন্দীপদের কয়েকজনের আপ্রাণ চেষ্টা এবং কর্তৃপক্ষের সুবিবেচনায়। ঘরের বউ বাইরের বড় পৃথিবীটাকে বুঝতে চেষ্টা করেছে একরাশ কৌতূহল নিয়ে। জেনেছে শুধুমাত্র ঘরের বউ হয়ে বাইরের এইসব ঘানিটানা ক্লান্ত নারী-পুরুষদের দুঃখের, দ্বন্দ্বের হদিস্ পাওয়া যায় না। চাকরী পাবার পর শ্বশুর বাড়ীর গলগ্রহ হয়ে থাকায় দায় থেকে সে নিষ্কৃতি পেয়েছে। একমাত্র মেয়ে মান্তুকে নিয়ে সে বাপের বাড়ীতে এসে উঠেছে এবং মধ্যবিত্ত সংসারের নিয়মানুসারে চাকরীর টাকাগুলোর জন্যে যোগ্য সমাদরও পেয়েছে সেখানে।

রমলার এখন ছাব্বিশ। দেহের গড়ন ও মুখের লাবণ্য এমনই যে মুখে না বলে কাউকে বোঝান যায় না যে, সে এই বয়সেই সবকিছু খুইয়ে বসে আছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার মনমরা গুমোট ভাবটা কেটে গেছে। তখন সে এমন একটা কিছু চাইছিল যা নিয়ে সে তার সব-হারানোর দুঃখ ভুলে থাকতে পারে। সেই 'একটা কিছুর' সন্ধান সন্দীপ তাকে দিয়েছে—চিনিয়েছে মিছিলের পথ। খেটেখাওয়া মানুষের বাঁচার যুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রামের সংকল্প নিয়েছে রমলা সেন।

অফিসে চাকরী করতে আসার প্রথম দিনগুলোর কথা মনে পড়ে

রমলার। সন্তস্বামীহারা এক তরুণীর ব্যথিতজীবনের বেদনাকরুণ ছায়া অফিসের প্রায় প্রত্যেকটি মানুষের মুখে প্রতিফলিত হয়েছিল সেদিন। তাই কয়েকশো সহকর্মীর মধ্যে থেকেও সে নিজেকে সবার থেকে কেমন বিচ্ছিন্ন অনুভব করতো। অবশ্য কেউ তাকে মুখ ফুটে সহানুভূতির কোন কথা শোনাতে আসেনি। সেটা আরও নির্মম পরিহাসের মত মনে হত রমলার। শুধু তাদের সেক্সানের পিওন মহাদেব, মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, মনের ভাব গোপন করতে না পেরে তাকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাতির করত—“দিদিমনি আপনার জল, দিদিমনি আপনার চা, দিদিমনি আপনার টিফিন আনি”—এসবই যে তার সহানুভূতির প্রকাশ, তা রমলা টের পেত।

কিন্তু একাউন্টসের সন্দীপ বোস ওসবের ধার ধারে না। সোজা এসে সামনের চেয়ারে ধপ্ করে বসে পড়ে বলে—

“কি এত চিঠি ডাইরী করছেন ঘাড় গুঁজে? ডিলিং অ্যাসিস্টান্টদের মারবেন নাকি? কালকের জন্য কিছু রাখুন। একেবারে টেবিল ফাঁকা করে বসে থাকলে পাবলিক ভাববে কাজ নেই, ফাঁকি মারছে। তারপর বলুন, কেমন লাগছে আমাদের অফিস?” সন্দীপের সহজ-স্বচ্ছন্দ ব্যবহার, সপ্রতিভতা এবং বলিষ্ঠ কণ্ঠের মধ্যে এমন একটা আন্তরিকতা আছে যা সত্যি মনকে ছুঁয়ে যায়। এই একটি লোকের সঙ্গে কথা বলে প্রথম দিন থেকেই সে সহজ হতে পেরেছে। কোনোদিন হয়তো একথা সেকথার পর মেয়ের খবর নিয়েছে সন্দীপ, তারপর হাতের ম্যাগাজিনটা এগিয়ে দিয়ে বলেছে—“এটা পড়ুন, রিলাক্স করুন। গোমড়া মুখে ঘাড় গুঁজে কাজ করা চলবে না। তা হলে পান্তুয়া বলে ডাকব। জানেন, আমি এই অফিসের অনেকের বিশেষ বিশেষ নামকরণ করি এবং পরবর্তীকালে সেই বিশেষ নামটা চালু হয়ে যায় এবং আসল নামটা লোকে ভুলে যায়। সুতরাং বুঝতেই পারছেন…।” রমলা এর পর আর হাসি চাপতে পারেনি। সন্দীপ খুশী হয়ে সিগারেট ধরিয়েছে।

প্রথমদিকে রমলা ভাবত বিয়ে থা করেনি, ব্যাচিলার মানুষ, তাই সন্দীপ এত প্রাণবন্ত। পাঁচরকম ব্যাপার নিয়ে দিন কাটিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু আর পাঁচটা ব্যাচিলার ইয়াং সহকর্মীর সঙ্গে তাকে যেন মেলানো যায় না। তারপর দিন কেটেছে, বছর ঘুরেছে। রমলা বুঝেছে একটা মানুষের মনের মধ্যে কোনোরকম মালিন্য না থাকলে তবেই সে সন্দীপের মত পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। সন্দীপ যেন 'সর্বঘটে কাঁঠালি কলা'। অফিসের ফুটবল ক্লাবের সেক্রেটারী, দার্জিলিং-এর কোন ইনস্টিটিউশন ক্রিকেট খেলায় নিমন্ত্রণ করেছে—সন্দীপ বোসের টিম রেডী ; রিক্রিয়েশন ক্লাবে কোন নাটক হবে—সন্দীপ বোস সিলেক্ট করবে। কোন পিওনের বাবার টি.বি. হয়েছে—চাঁদার লিষ্ট হাতে সন্দীপ, কে কাকে ল্যাং মেরে প্রমোশন পাচ্ছে তার বিরুদ্ধে সন্দীপ বোস ডেপুটেশন দিচ্ছে কর্তৃপক্ষের কাছে, আবার কোনোদিন বিকেলে অথবা সন্ধ্যায়, ক্যাফে ডি মণিকোতে সন্দীপ বোসকে দেখতে পাবেন একমনে গল্প বা কবিতা লিখতে। কয়েকটা নামকরা ম্যাগাজিনে তার লেখা নিয়মিত বেরিয়ে থাকে। কিন্তু সন্দীপ সবচেয়ে সিরিয়াস জীবন-জীবিকার-সংগ্রামে—স্কোয়াড, মিটিং, শ্লোগান, বক্তৃতা, কনফারেন্স—সে তার ধ্যান-ধারণায় একমুখী।

সেদিন সারাদিন দপ্তরে দপ্তরে স্কোয়াড করে, বক্তৃতা দিয়ে ক্লান্ত সন্দীপ রমলার মুখোমুখী হল। ঝালমুড়ীর ঠোঙাটা এগিয়ে দিয়ে বলল —"আজ আপনাকে মিছিলে যেতে হবে মিসেস সেন। ঠিক সাড়ে-পাঁচটায় মার্টিণবার্ণের সামনে জমায়েত, তারপর মিছিল করে ওয়েলিংটন স্কোয়ার—বিষয়, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদ, বরখাস্ত কর্মীদের পূর্ণবহাল ইত্যাদি। তৈরি হয়ে নিন। আপনাকে মেয়েদের লীডার বানিয়ে দেব। রমলার তখন বেশ অপ্রস্তুত অবস্থা। তার এই একবছরের ছোট্ট চাকরী জীবন, ডালহৌসী, বউবাজার, শিয়ালদা আর বাড়ীর গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ। কখন মিটিং শেষ হবে, কেমন করে একা রাত করে বাড়ী ফিরবে ? অথচ এই নার্ভাস অবস্থাটা সন্দীপকে

জানাতে তার কেমন লজ্জা হচ্ছিল। অথচ কি আশ্চর্য্য। তাকে চুপ করে থাকতে দেখে সন্দীপ গড়গড় করে তার মনের প্রশ্নগুলো একে একে বলে গেল যা সে মুখে প্রকাশ করেনি। তারপর বলল—"ঠিক আছে আপনার সব দায়িত্ব আমার। সভার সামনের দিকে কাগজ পেতে লক্ষ্মীমেয়ের মতো বসে বাদাম ভাজা খাবেন। বক্তৃতা শেষ করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি নিজে আপনাকে শিয়ালদায় পৌঁছে ট্রেণে তুলে দিয়ে আসব— দরকার হলে বাড়ীও পৌঁছে দেব। কেমন, এবার রাজীতো ?"

রমলা সম্মতি জানিয়েছিল। সন্দীপের কথার মধ্যে এমন একটা দৃঢ় প্রত্যয় আছে যা সাইরেনের অল্‌ক্লিয়ার সাউণ্ডের মত। তবু 'আপনার সব দায়িত্ব আমার' কথাটা কেন যে রমলার মনের গভীরে ঘুরপাক খেতে থাকে সে নিজেই তা বুঝতে পারে না। রমলার এ রকম হয়। কোন বিশেষ শব্দ, কোন কথা বা একটা গানের কলি কিংবা পরিচিত কোন মুখের ছবি তার মনে এক একদিন অনেকক্ষণ ধরে—হয়তো সারাদিন, ঘুমিয়ে পড়ার আগে পর্যন্ত এইরকম ঘুরপাক খায়। সে বিরক্ত হয়। তাড়াবার চেষ্টা করে মন থেকে, পারে না। তারপর আপনিই চলে যায় কখন রমলা তা টের পায় না। এই যে 'আপনার সব দায়িত্ব আমার' কথাটা তার মনে ঘুরপাক খাওয়ার কি দরকার আছে? নেহাতই কথার কথা, তবু কথাটা তার মনে ঘুরপাক খাবেই—তাকে লজ্জা দিয়ে শাস্তি দেবেই। একটা আলপিন নিয়ে হাতের আঙ্গুলে ফুটিয়ে ব্যথা অনুভব করে অন্যমনস্ক হতে চাইল সে। ড্রয়ার থেকে চারটে লবঙ্গ নিয়ে একসঙ্গে চিবিয়ে ফেলল। ভীষণ ঝাল লাগলে কথাটা যদি মন থেকে যায়। না যায় না ; বরং বেশী করে মনে পড়ে দৈহিক পীড়নের কারণ অনুসন্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই। সে ঘড়ির দিকে চাইলো। অকারণে খানিক টেবিল গোছালো, ফাইলগুলো সাজিয়ে রাখলো। ড্রয়ারে চাবি দিয়ে, ব্যাগ নিয়ে যখন সে উঠে দাঁড়ালো তখন ঠিক সাড়ে পাঁচটা। ঠিক সময়ে, হয়তো ঠিক পথেই রমলার যাত্রা হলো শুরু।

সব পথের শেষ আছে, কিন্তু নির্যাতিতের সংগ্রামী পথের বুঝি শেষ নেই! অনেক পথ হেঁটেছে রমলা তারপর; সন্দীপের পাশা-পাশি লড়াকু সৈনিকদের একজন হয়ে। সাথেসাথে চলেছে পড়াশোনাও। ইউনিভার্সিটিতে ডিগ্রী নেবার পড়াশোনা নয়—সত্যি পৃথিবীর বাস্তব ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়েছে সে, জেনেছে মানব সভ্যতার বয়স বেড়েছে কিন্তু মানুষ সভ্য হয়নি আজও। সত্যিকারের সভ্য মানুষ কখনও শোষণ ও বঞ্চনাকে বরদাস্ত করতে পারে না। জীবন সংগ্রামী এক সৈনিকের শিক্ষার প্রয়োজনে যে স্তরে যেমনটি দরকার ঠিক তেমনিভাবে বইপত্র ইত্যাদির মালমশলা জুগিয়ে সন্দীপ বোস 'দক্ষ কারিগরের' মত এক প্রতিমা গড়েছে। সে প্রতিমা লজ্জাবিধূরা গৃহবধূ রমলাবৌদি নয় কিংবা দশটা-পাঁচটায় ক্লান্ত ম্রিয়মান এক অফিসকর্মীই শুধু নয়—সে এখন কর্মচারী সমিতির—ক্যালকাটা জোনের কন্‌ভেনার মিসেস রমলা সেন, যাঁর সাংগঠনিক শক্তি প্রচণ্ড—কর্তব্যনিষ্ঠা অতুলনীয়। বিগত কয়েক বছরের কার্যা-বলী বিশ্লেষণ করে সমিতি তাঁকে এই কন্‌ভেনার পদের বিশেষ দায়িত্ব-পূর্ণ গুরুভার অর্পণ করেছে।

ইতিমধ্যে দেশে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হয়েছে। কর্মচারী-আন্দোলনের প্রবল চাপের ফলে কর্তৃপক্ষ বেকায়দা হয়ে মারমুখী হয়েছে, মরিয়া হয়ে স্বৈরাচারী কায়দায় পাল্টা আক্রমণ চালিয়েছে, বরখাস্ত কর্মীদের তালিকা আরও দীর্ঘ হয়েছে, এবং সেই তালিকায় সন্দীপ বোসের নামটাও স্থান পেয়েছে। সন্দীপ ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরেছিল অনেক আগেই। স্বভাবতঃই তার মনে এ ব্যাপারে তেমন কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়নি। কিন্তু রমলা এতখানি ভাবতে পারেনি। তাই খবরটা পাবার পর সে কেমন যেন একটু নার্ভাস হয়ে পড়েছিলো। কিন্তু সেদিন বিকালে সমিতির অফিসে সন্দীপ সেই আদি ও অকৃত্রিম হাসিমুখে বললে—"দেখলেতো রমলা, রাজা-বাহাদুরের চোখে আমি কেমন কেউকেটা, দামী লোক হয়ে পড়েছি,

অবশ্য তোমাদের থেকে আলাদা করে দিয়ে বেশ ভাল করেই লড়াই করার সুযোগ করে দিলে। কি হিংসে হচ্ছে নাকি?"

মুগ্ধ-বিস্ময়ে রমলা আর এক শিক্ষা পেল—লড়াই-এ আহত যোদ্ধার মনোবল কেমন হওয়া উচিত! সেই মুহূর্তে মনে মনে রমলা এক কঠিন প্রতিজ্ঞা করে ফেললো—হয় সেও ঐ তালিকায় স্থান করে নেবে সন্দীপদের পাশে আর না হয় ঐ তালিকাটা একদিন সংরক্ষিত থাকবে—শুধুমাত্র একখানা বাতিল নথিপত্র হয়ে সরকারী রেকর্ড রুমে, অত্যাচারিত সংগ্রামী মানুষের ত্যাগ-স্বীকারের নীরব সাক্ষী হয়ে। সংকল্পের কঠিন দীপ্তিতে তখন রমলার মুখ দৃঢ়—গম্ভীর। সন্দীপ তার মুখের দিকে তাকিয়ে মনের ভাবটুকু বোঝবার চেষ্টা করতে করতে বলল—

'রমলা, তোমাকে আজকে সত্যি হেডমিস্ট্রেস হেডমিস্ট্রেস···সরি, কনভেনার, কনভেনার লাগছে—বড় গম্ভীর, ব্যাপার কি বলত?' হ্যাঁ, অনেকদিন আগেই ওরা 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে আপোষ করে নিয়েছে। অবশ্য এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা সন্দীপেরই ছিল। যে ব্যাপারটা যতদিন যতখানি প্রয়োজন ঠিক ততদিন ততটুকুই সে বরদাস্ত করবে, তার বেশী একদিনও নয়।

সেদিন জেনারেল কাউন্সিলএর জরুরী এবং গুরুত্বপূর্ণ মিটিং শেষ করে রমলা গৃহাভিমুখী। সন্দীপও সঙ্গে আছে, অলিখিত চুক্তির দায়িত্ব সম্পাদন করতে অর্থাৎ তাকে সঙ্গে নিয়ে শিয়ালদা পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া এবং ইত্যাবসরে বাদ পড়ে যাওয়া খুঁটিনাটি আলোচনা, সংগঠন, কর্মচারী-আন্দোলন ইত্যাদি ব্যাপারে বলাবাহুল্য। বর্ষার রাত, টিপ টিপ বৃষ্টি—নটা বাজে। লালবাজার স্টপেজে ওরা বাস কিংবা ট্রামের অপেক্ষায়। সন্দীপ হঠাৎ এক কাণ্ড করে বসল। রমলা এমন উচ্ছ্বসিত সন্দীপকে কোনদিন দেখেনি। রমলার একটা হাত ধরে বেশ জোরে ঝাঁকানি দিয়ে সন্দীপ বলল—

'কনগ্রাচুলেসনস্, সত্যি রমলা আজ আমার ভীষণ আনন্দ হচ্ছে।

আজকের কাউন্সিল মিটিংএ প্রস্তাবিত আগামী ২৭ তারিখ থেকে কন্‌টিনিউয়াস স্ট্রাইক-এর সপক্ষে তোমার বক্তৃতা, ভাষায়, তথ্যে, উদ্দীপনায় এবং আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ এবং সমৃদ্ধ, যা আমাদের মনকে ছুঁয়ে গ্যাছে, এমনকি বিপক্ষের মিনমিনে সদস্যদেরও কনভিন্স করতে পেরেছে বলে মনে হয়। আমাদের যাত্রাপথের গতি কেউ রুখতে পারবে না তা দেখে নিও।' আনন্দে, আবেগে সন্দীপের চোখেমুখে এক অদ্ভুদ অভিব্যক্তি—যেন এক সূর্যোদয়ের প্রস্তুতি। রমলা গভীর ছুচোখে সন্দীপের পানে অপলক তাকিয়ে থাকে। এদিকে মন্থর গতিতে একটা চোদ্দ নম্বর প্রায় খালি ট্রাম এগিয়ে আসে, পরিবেশ পরিবর্তিত হয়। তারা চটপট ট্রামটাতে উঠে পড়ে।

তারপর কঠিন সংগ্রামের চরম পরীক্ষার সময় এগিয়ে আসে। কিন্তু কর্মচারীদের অটুট সংগ্রামী মানসিকতার কাছে কর্তৃপক্ষের দমননীতি পর্যুদস্ত—পরাস্ত হয়। তারপর 'অল কোয়ায়েট।' লাগাতার ধর্ম-ঘটের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের বন্ধুর পথ পার হয়ে রণক্লান্ত বিজয়ী সৈনিক-কর্মচারীরা আজ বিজয়োল্লাসে মুখর। তাই আজকের সাধারণ সভা, বরখাস্ত কর্মীদের পুনর্বহাল-সম্বর্ধনা-সভা। ক্যান্টিন হলের প্রশস্ত চত্বরে আজ আলোর রোশনাই, ফুলের সমারোহ—অসংখ্য হাসিমুখে খুশীর বন্যা। ডায়াসে আজ শুধু সারি সারি চেয়ারে উপবিষ্ট সেইসব যোদ্ধা যাঁরা নতুন করে—রুজি রোজগারের দাবি আদায় করে নিয়েছেন। ঘোষক পর পর নাম বলে যাচ্ছেন, একটা ছোট্ট ফুটফুটে মেয়ে একে একে প্রত্যেককে ফুলের মালা পরিয়ে দিচ্ছে। লাউড-স্পীকারে ঘোষকের কণ্ঠ শোনা গেল—

'সন্দীপ বসু, সেক্রেটারি, ক্যালকাটা জোন।' একমুখ হাসি নিয়ে মেয়েটি এগিয়ে গেল মালা হাতে। কাছাকাছি হতেই সন্দীপ তাকে ছুহাত বাড়িয়ে বুকে তুলে নিয়ে আদর করল। অতলোকের সামনে লজ্জায় 'মাস্তু' সন্দীপের বুকে মাথা গুজলো। সামনের সারিতে বসেও

রমলা সেন সেই দৃশ্যটা তেমন করে উপভোগ করতে পারলেন না। না জানি কেমন করে কয়েক ফোঁটা চোখের জল তাঁর চশমার কাঁচকে ঝাপ্‌সা করে দিয়েছে।

———

তবুও বসন্ত আসে

সেদিন ঘণ্টাখানেক আগে প্রণব অফিস থেকে বেরিয়ে পড়েছিল। শ্যাম্‌বাজারে ছোট পিসীর বাড়ী একবার যাওয়ার দরকার, নিতান্তই পারিবারিক তুচ্ছ ব্যাপার, শুধুই কর্তব্যের ঝামেলা। অফিস পাড়ার কলকাতায় আজকাল ট্রাম বাসের অবস্থা বাড়ীর লোকে বুঝেও বোঝে না—কোথায় ভবানীপুর আর কোথায় শ্যামবাজার—বিপথ্‌গামী হওয়ার প্রয়োজনে প্রণবের মনে একরাশ্‌ বিরক্তি।

ভাগ্য সুপ্রসন্ন—সামনেই একটা তু নম্বর ট্রামে পা রাখার চান্স্‌ পেয়ে উঠে পড়লো সে এবং যথারীতি 'জোর যার মুল্লুক্‌ তার' প্রয়োগ করে ভীড় ঠেলে সামনে এগিয়ে গেল, কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়াতেই সামনের এক ভদ্রলোক সিট্‌ ছেড়ে উঠে পড়লেন। অপ্রত্যাশিত ব্যাপার, কলেজস্ট্রীট্‌গামী এই সময়ের ট্রামের সিট্‌ সাধারণতঃ এই বেণ্টিং-লালবাজার ক্রসিংএ খালি হবার কথা নয়। বোধহয় ভুল করেই ভদ্রলোক তু নম্বরে উঠেছিলেন। লটারীর টিকেটে টাকা পাওয়ার মত ভীড়ের ট্রামে খালি সিটের দখল পেয়ে প্রণবের বিরক্তি ভাবটা যখন শরতের মেঘের মত উড়ে যেতে শুরু করেছে ঠিক তখনই সে দেখতে পেল আরতিকে, 'মহিলাদিগের জন্য' একটা সিটে, মনে হয় কিছু একটা পড়ছে ঘাড় নীচু করে। আরতির কাছে সব সময় একটা বই কিংবা পত্র পত্রিকা থাকেই, পাঁচ বছর আগের সেই অভ্যাসটা তাহলে আরতির এখনও আছে! সাইড্‌ থেকে একটু পিছিয়ে এসে ক্যামেরার ভিউ নিলে যেমনভাবে পাওয়া যায়, ঠিক তেমনিভাবে আরতির পিঠের সর্পিল বেণী, ছোট্ট কপালের ওপর হাওয়ায়-ওড়া অবিন্যস্ত চুলের বেয়াদপি, ভ্রূ, চোখ এবং টিকোলো নাক্‌—প্রণব দেখছিল। কিন্তু এই দেখাটা হঠাৎ আবিষ্কারের মত কয়েক মুহূর্তের। একদা-প্রত্যাখ্যাত কোন নারীর মুখোমুখী হওয়া রীতিমত অস্বস্তিকর

ব্যাপার—অন্ততঃ প্রত্যাখ্যানের কারণ যেখানে 'বাঙ্গালীর ছেলে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে তারপর জীবনের সেটেলড্' হবার যুক্তি দিয়ে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার মত এক ধরনের ভীরু মানসিকতা এবং তারপর 'হাঁটি-হাঁটি পা পা' শিখে বেকার জীবনের শিক্ষানবিশী প্রেম-প্রেম খেলা ভুলে বাপ্‌মায়ের সুবোধ ছেলে হয়ে ঘড়ি-আংটি, খাট-বিছানা, নগদ এবং সোনাদানাসহ একটি নধর বউ ইত্যাদি লোভের সুখ জড়িয়ে থাকে। তবুও বসন্ত ঘুরে ঘুরে আসে, মনের গভীরে একান্তে একদা ভালো-লাগার মোহময় উত্তাপটুকু বোধহয় থেকেই যায়! স্বভাবতঃই একটা অসহায় বিষণ্ণ-ভাব প্রণবের মনকে আচ্ছন্ন করছিল। সে স্থির করল গ্রে স্ট্রীটের স্টপেজে আরতির নামার আগেই সে নেমে পড়বে, হয়তো খানিকটা হাঁটতে হবে, তবুও অন্ততঃ এমন একটা সম্পর্কের সূত্র ধরে অবাঞ্ছিত দেখা হওয়ার অস্বস্থিকর ঘটনাটা এড়ানো যাবে। কিন্তু প্রণবের নিজেকে আড়াল করার এই যে দুর্বলতা এ বড়ো গ্লানিময় লজ্জার—একরাশ নিরুক্ত কান্নার মত বেদনার্ত, প্রণয়ের মনে এই মুহূর্তে বিষণ্ণতার আলোছায়া খেলা। মনে পড়ে পাঁচবছর আগের লজ্জামলিন ছোট্ট ঘটনাটির কথা, সাবধানী প্রণব যেদিন বুঝেছিল 'বর্ণহীন এই প্রেমপ্রেম খেলা' শেষ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। 'নুন আনতে পান্তা ফুরোয়' ঘরের নিতান্ত সাদামাটা একটা মেয়ের সঙ্গে জীবন জড়ানোর লাভক্ষতির দিকটাই প্রণব সেদিন বেশী করে ভেবেছিল। হিসেব করে চলতে গিয়ে সত্যিকার ভালোবাসার দুর্লভ সেই 'পরশমণি' 'যার ছোঁয়াতে সকল দুঃখ সোনা হয়' এমনই করেই আমাদের জীবন থেকে হারিয়ে যায়।

ট্রামটা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে, প্রেসিডেন্সী কলেজ পার হয়ে মহাত্মা গান্ধী রোডের ক্রসিংএ—ট্রাফিক জ্যাম। মিনিট পনেরো পার হয়ে গেছে, বিহারী ট্রামচালক যথানিয়মে খৈনি তৈরী করতে করতে রিল্যাক্স করছে। সহযাত্রীরা অনেকেই নেমে পড়তে তৎপর। এরপর কালক্ষেপ সমীচীন নয়, প্রণব উঠে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু গেটের দিকে

যাবার জন্যে পিছন ফেরবার ঠিক আগের মুহূর্তে সেই অনাকাঙ্ক্ষিত বিপত্তি—আরতিও উঠে দাঁড়িয়ে 'এবাউট টার্ণ'—একেবারে সোজা-সুজি দৃষ্টিপাত—পথচল্‌তি নয় যা, না-দেখার ভান করা চলে অথবা পরস্পর অন্যমনস্কতার সুযোগে নজর এড়িয়ে যাওয়াও নয়। কয়েকটি মুহূর্ত—প্রণব চোখ নামিয়ে নেবার আগেই আরতি নিজেকে গুছিয়ে নিয়েছে, এগিয়ে এসেছে প্রায় সহজ ও সপ্রতিভ ভঙ্গিতে, মুখের সেই সহজ হাসিটুকু জড়িয়ে প্রশ্ন করেছে, 'আরে প্রণব, তুমি এদিকে কোথায় ?'

'এই একটু এদিকেই···মানে একটা কাজে···' অনেক চেষ্টা করেও প্রণব তার জবাবটা আদৌ গুছিয়ে বলতে পারলো না, গলার স্বরও একটু বেসুরো লাগলো নিজেরই কাছে। সহযাত্রীরা পিছনে 'কিউ' দিয়েছে, অনেকে নেমে পড়তে চায়। সুতরাং এভাবে দাঁড়িয়ে থেকে কথা বলা চলে না। প্রণব আগে, পিছনে আরতি গেট অভিমুখী, কিছু-ক্ষণের দুর্লভ বিরতি, নিজেদের যাহোক একটু গুছিয়ে নেওয়ার অপ্রত্যাশিত সুযোগ। ফুটপাথে পুরোনো বই স্টলের একপাশে পথ-চল্‌তি লোকজনের ভীড় এড়িয়ে ওরা এখন পরস্পরের মুখোমুখী আরতির চোখে একরাশ জিজ্ঞাসা ঃ

'তারপর, খবর কি প্রণব, কেমন আছো ? কতদিন পরে দেখা—প্রায় একযুগ—তাই না। এদিকে কোথায়, সাউথের লোক নর্থে কেন, পথ ভুলে নাকি !'

প্রণবের মনে বিস্ময়, এতদিন পরে অপ্রত্যাশিত দেখা হওয়ার পর যে ব্যাপারটা নিতান্ত স্বাভাবিকভাবে ঘটা সম্ভব বলে সে মনে মনে আশঙ্কা করেছিল, তেমন কিছুতো হলো না। ভেবেছিল, আরতি হয়ত গম্ভীর হয়ে যাবে, নেহাৎ একেবারে চোখে-চোখে দেখা তাই কয়েকটা মাপা কথা, তারপর 'আচ্ছা চলি' যেন খুব তাড়া—একমুহূর্ত অপচয়ের অবকাশ নেই, এভাবেই আরতি নিজেকে সরিয়ে নেবে আহত অভিমানে কিংবা অসহ্য ঘৃণায়—এই উপেক্ষা হাজার যা

চাবুকের থেকেও তীব্র যন্ত্রণার, তাই মুখোমুখী হওয়ার আগেই প্রণব চোরের মত পলায়নই শ্রেয় মনে করেছিল। কিন্তু ঝড় উঠলো না, শান্ত আকাশ স্নিগ্ধ ও বিষণ্ণ, প্রণব নার্ভ পেল, সহজ হলো, বললো,

'ছোট পিসীর বাড়ী যাচ্ছিলাম—শ্যামবাজারে, তা যেরকম জ্যাম্ দেখছি তাতে তো হাঁটা ছাড়া কোন উপায় নেই। যাই হোক তোমাব খবর বল—কেমন আছ, কোথা থেকে ফিরছ, মেসোমশাই, বড়দি, মেজদি, বাপ্পা—সবাই কেমন?' আরতির মুখে একটুকরো বিষণ্ণ মেঘের মলিন ছায়া, 'আমার আবার খবর কি? সেই যথাপূর্বং—মোটামুটি যেমন তেমন করে দিন কেটে যায়। তবে বাড়ীর খবব তোমার না শোনাই ভাল, তোমার সঙ্গে এই কয়েক মুহূর্তের হঠাৎ দেখা—বিপদ আপদের কথা শুনিয়ে দুঃখের ভাগ দিতে চাই না।'

'বিপদ-আপদ! কার বিপদ—কি হয়েছে আরতি, প্লীজ...।' প্রণবের কণ্ঠে গভীব উদ্বেগ। আরতির কণ্ঠ প্রায় অবরুদ্ধ:

'বাবা এখন পুরোপুরি বিছানায়। সাত আট মাস আগে একদিন সিঁড়িতে মাথা ঘুরে পড়ে যান—তারপর ডাক্তার, হাসপাতাল, চার পাঁচদিন সেনস্‌লেস—সেই দিনগুলো আমার কিভাবে যে কেটেছে—আমরা তো আশাই ছেড়ে দিয়েছিলাম, একমাস হাসপাতালে থাকার পর বাড়ী আনা হয়েছে, শরীরের বাঁ দিকটা একদম প্যারালাইজড হয়ে গেছে।' প্রণব নিঃশব্দ, এই মুহূর্তে আরতিকে সে কি বলবে—কি বলা যায়—ভাবতে ভাবতে সে চুপ করেই রইলো। ইতিমধ্যে ওরা হাঁটা শুরু করেছে নিজেদেরই অজান্তে। কিছুক্ষণ চুপচাপ হেঁটে চলা, প্রণব ম্রিয়মান—এই মুহূর্তে সে মনে মনে কোন সান্ত্বনার ভাষা খুঁজে পায় না, এই 'নীববতাই' হয়ত আরতির বেদনা-করুণ মনের একমাত্র নিরাময়, প্রণবের মনে হলো। তারপর একসময় আরতিই কথা বলে 'জানো প্রণব, আমার সবসময়ই মনে হয় বাবার এই অবস্থার জন্যে আমরাই দায়ী, এই আমি, বড়দি মেজদি যদি মেয়ে না হয়ে ছেলে হতাম তাহলে এতখানি দায়িত্বের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে

বাবা এমন করে ভেঙ্গে পড়তেন না। ছেলেপুলে নিয়ে বিধবা বড়দির দায়িত্ব, মেজদির বিয়ের ভাবনা—মা বেঁচে থাকলে হয়ত এত সমস্যার গভীরেও বাবার একটা ভরসা থাকতো। জানো, নিজেকে আমার ভীষণ অপরাধী মনে হয়।' কথায় কথায় ওরা বিডন স্ট্রীটের ক্রসিং-এ এসে পড়েছে। প্রণব বললো, 'তোমার যদি তাড়া না থাকে, চল না একটু চা খাওয়া যাক'। আরতি সহজভাবেই সম্মতি জানাল, ও'রা 'বসন্ত কেবিনের' দোতলায় নিরিবিলি এক কোণে একটা পরিচিত এবং নির্দিষ্ট ঘেরাটোপে মুখোমুখী হ'ল যেখানে পাঁচবছর আগে ওদের অনেক বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হয়েছে। চা এলো, ওরা নিঃশব্দে বিষণ্ণ মুহূর্তগুলো পার হয়ে যাচ্ছিল। আরতিই নীরবতা ভঙ্গ করে বললো, 'যাক ওসব কথা, দুঃখের ভাগ কাউকে দিতে নেই, তবু না বলে পারলাম না। এবার তোমার কথা বল, বিয়ে করেছো নিশ্চয়ই, টুলুর কাছে অনেকদিন আগে একবার শুনেছিলাম তোমার বিয়ের কথাবার্ত্তা পাকাপাকি হতে চলেছে। বৌ কেমন হয়েছে, নিশ্চয়ই খুব সুন্দরী। কবে দেখাচ্ছ বলো?' প্রণব চোখ নামিয়ে নিয়ে অকারণে টেবিল সল্টের শিশিটা নাড়াচাড়া করছিল, তারপর এক আশ্চর্য ব্যাপার—একটা প্রচণ্ড মিথ্যে কেমন সহজ সত্যের মত হঠাৎ তার মুখ থেকে অকপটে বেরিয়ে এলো,—প্রণব বিয়ে করেছে, নীলিমাকে মোটামুটি সুন্দরীই বলা চলে, ছেলের নাম 'অর্ণব'—খুব দুষ্টু হয়েছে, চাকরীতে একটা প্রমোশন হয়েছে, সে এখন মোটামুটি 'হ্যাপী'—এই অপ্রয়োজনীয় সত্যিগুলোকে নিঃসঙ্কোচে হত্যা করে, 'বৌ টৌ এখনও হয়নি, যা রোজগার করি নিজেরই চলে না তো বৌকে খাওয়াব কি—হলে তো জানতেই পারতে' ইত্যাদি তাৎক্ষণিক মিথ্যার প্রয়োজনীয় লোভের আকর্ষণ ভয়ংকর এক অক্টোপাশের মত প্রণবকে আষ্টেপিষ্ঠে জড়িয়ে ধরলো—মনের অবচেতনে কোন দুর্বল মুহূর্তে এই রকম নিষ্ঠুর মিথ্যের জন্ম কেমন করে হয়—কে জানে!

'তোমার বিয়ে হলে আমি জানতে পারতাম কিংবা তুমি আমায়

জানাতেই—নেমতন্ন করতে নাকি। আমি তো জানি ছেলেরা বিয়ের সময় ঐ নিষ্ঠুর অথচ মহৎ কাজটি কখনও করে না। ওটা তোমার মনের কথা নয় প্রণব, নিতান্তই কথার জন্য কথা—হঠাৎ দেখা হলো তাই! অবশ্য আজ আর এসব কথার কোন মানে হয় না, তুমি হয়তো বিরক্ত হচ্ছো'।

'না না বিরক্ত হবার কি আছে।' ছলনা-বিষের কামড়ে প্রণবের মনে তীব্র জ্বালাময় অনুভূতি। আরতি বললো 'কি ভেবে তুমি হঠাৎ নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলে জানি না কিন্তু আমি তো তোমায় কোনদিন দাবী করিনি প্রণব, তুমি একসময় আমার সঙ্গী ছিলে তাই বলে 'চিরদিনের' হবে এমন আশা করব কেন? আর কোন দিন দেখা হবে কিনা জানি না, তাই তোমায় একটা কথা জানিয়ে দিই—তোমার এই যে দূরে সরে যাওয়া এটা আমার যতখানি কষ্টের তার থেকে আরও অনেক বেশী যন্ত্রণাময় তোমার আজকের এই মিথ্যের ছলনা। নীলিমা সত্যি খুব ভালো মেয়ে, স্কুলের বন্ধুত্বকে স্মরণে রেখে তার বিয়ের সময় আমায় কার্ড পাঠিয়েছিল সেইসঙ্গে নিজের হাতে চিঠি লিখে মিনতি করেছিল যেন তার বর দেখতে যেতে একটু সময় করে নিতে পারি; সেই সঙ্গে তার ভাবী বরের নামধাম রূপগুণ ও পেশার বর্ণনা দিয়ে একটা দুর্ঘটনার হাত থেকে আমায় বাঁচিয়ে দিয়েছিল। তুমি বিয়ে করেছ কিনা জানতে চেয়ে, তোমাকে মিথ্যে ছলনার আশ্রয় নেওয়ার সুযোগ করে দিয়ে, তোমায় লোভী করে তুলে আজ আমিও যে অন্যায় করেছি, তার জন্যে আমায় ক্ষমা করো প্রণব।' আরতির অশ্রুবিন্দু, মুক্তোবিন্দু হয়ে ঝরে পড়লো। গ্রহণলাগা সূর্যের মত একটা সরীসৃপ-বিষন্নতা প্রণবের অপরাধী মনকে এই মুহূর্তে পাকেপাকে জড়িয়ে ফেলছিল—একটা দলাপাকানো যন্ত্রণার অনুভূতি নিয়ে সে চায়ের কাপে চামচ নাড়তে লাগল—নিঃশব্দে।

স্যুট

ভেতরটা সুড়সুড় করছে, যেন খানিকটা বরফ অজিতের নাকের ডগায় ছুঁইয়ে রাখা হয়েছে। কদিন বেশ জমিয়ে শীত পড়েছে, রাতের দিকের হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডা হাওয়া ভোরে রাজ্যের কুয়াশা জড়ো করেছে। বাঁদিকের বগলে লণ্ড্রী থেকে ইস্ত্রিকরা জামাকাপড় আর ডান হাতে বাজারের ব্যাগে ফুলকপি, বেগুন, আলু, ধনেপাতা, কাঁচা-লঙ্কা আর পাতিলেবু—অথচ নাক্‌টা একবার ঝাড়তেই হয়, অনেকক্ষণ টেনে রাখা হয়েছে। হিদারাম ব্যানার্জি লেনের মুখে দাঁড়িয়ে বাজারের থলি নামিয়ে অজিত আয়েশ করে নাক ঝাড়ে—ফোঁঃ, ফ্যাঃ বিকট শব্দ হয়—বেশ খানিকটা তরল সর্দি রবীন্দ্রসদনের ফোয়ারার মত অনেকটা জায়গা নিয়ে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। একজন টিপ্‌টপ্‌ ইয়াংম্যান ছিটকে তফাৎ দিয়ে চলে যান। নাকটা খানিক হালকা হাওয়ায় কিছুটা স্বস্তিবোধ হয়, র‍্যাপারের উল্টোদিক দিয়ে মুছেটুছে বাজারের থলিটা আবার হাতে নিয়ে অজিত তাড়াতাড়ি বাড়ীর দিকে হাঁটা দেয়।

এমনিতেই খানিকটা দেরী হয়ে গ্যাছে—সাড়েসাতটা বাজে। সকালের টিউস্যানীটা সারতে হবে তারপর স্নানখাওয়া করে অফিস।-দাড়ি-কামানোটা না হয় বাদই দেওয়া গেল। ঐ ব্যাপারটা আগের মত আর তেমন জরুরী মনে করে না অজিত। আয়নায় মুখ-দেখা সারাদিনে একবারই—স্নান করে দায়সারা গোছের দ্রুত হস্তসঞ্চালনে কেশ বিন্যাসের প্রয়াস, তাও আর পাঁচটা ঝামেলার জট ছাড়াবার চিন্তার মাঝখান দিয়ে ব্যাপারটা সম্পন্ন করা হয়, ফলে মুখের দিকে ভালো করে তাকাবার অবকাশ থাকে না। সুতরাং 'ডিসেন্সির' প্রশ্নটা আজকাল বেবাক হাওয়া। স্কুল-কলেজে অজিত ভালো দৌড়োতে পারত, কিন্তু ফার্স্ট-সেকেণ্ড ভিক্টরী স্ট্যাণ্ডে দাঁড়াবার সৌভাগ্য তার

খুব বেশী হয়নি—রানিং সু-ওয়ালারা খালিপায়ের অজিতকে স্টেপিংএ মেরে দিত। ভাল সাজ-সরঞ্জাম ছাড়া উন্নত প্রথায় চাষআবাদ হয় না। অতএব তাড়াহুড়ো করলে কি হবে, খুব একটা সময় বাঁচানো যায় না। অজিতকে খানিকটা সন্তর্পণে হাঁটতে হয়, বাঁপায়ের শ্লিপারের বুড়োআঙ্গুলের স্ট্রাপটা বেশ কয়েকবার মেরামতির ফলে খুব ছোট হয়ে গ্যাছে, আঙ্গুলটা গলে না—শুধু ডগাটা একটু ছুঁয়ে থাকে, সুতরাং বাঁ পাটা টেনে টেনে চলতে হয়। নাকটা সুড়সুড় করতেই থাকে, জোরে জোরে ভিতর দিকে দমকা শ্বাস টেনে নেওয়ায় চোখে জলের সঙ্গে একটা হাঁচির বেগ আসে। পেল্লাই একটা 'ধম্মের ষাঁড়' ঘোৎ ঘোৎ করতে করতে বেমক্কা সামনে এগিয়ে আসায় হাতে বাজারের থলি-জামাকাপড় সামলে 'বডি বেন্ট' করে মহাপ্রভুকে সাইড দিতে গিয়ে অন্যমনস্কতায় অজিতের হাঁচির বেগটা সামলে যায়।

বাড়ী ফিরে দ্যাখে মিনুকে দুধ খাইয়ে, কাজল পরিয়ে, ফ্যানেলের জামা-মোজা-কানঢাকাটুপি চাপিয়ে প্রীতি সকালের অনেক কাজ এগিয়ে ফেলেছে। বাজারের থলির পরিবর্তে মিনুকে হস্তান্তর করে প্রীতি রান্নাঘরে ঢোকে, ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে চায়ের জল বসায়। আলনা থেকে প্রীতির প্রায়-বাতিল একটা ছেঁড়া ব্লাউজ নিয়ে অজিত আয়েস করে নাক ঝেড়ে অনেকখানি ভিজিয়ে ফ্যালে এবং বাপের কাণ্ডকারখানা দেখে মজা পেয়ে মিনু খিল-খিল করে হেসে ওঠে, দুহাতে তালি দেয়।

'একটু আদা থেঁতো করে দিও—হ্যাঁচ্‌চ-ছোঃ' বিকট শব্দ করে অজিত হেঁচে দেয়, পুরোনো একতলা ভাড়াবাড়ীর চুনবালি বুঝি খসে পড়ে। প্রীতি গজগজ করে, 'পই পই করে বলি, নতুন ঠাণ্ডা পড়েছে সাবধান হও, সাবধান হও। মেয়েছেলের কথা কে শোনে! এবার বোঝ।' চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে বলে, 'আজ আর বেরোতে হবে না' চুপচাপ শুয়ে থাক, ঠাণ্ডা লেগেছে—জ্বরটর হতে কতক্ষণ'! অজিতের বুকে কপালে হাত দিয়ে প্রীতি উত্তাপের-পরীক্ষা চালায়। বাপের

বুকে অবস্থানরত মিনুর ইদৃশ ব্যাপার সহ্য হয় না, মাকে ঠেলা দিয়ে সরিয়ে দিতে চায়।

'ওরে হিংসুটে মেয়ে, বাপের প্রতি আদিখ্যেতা দেখান হচ্ছে, মা বুঝি এখন কেউ নয়' কপট রাগে প্রীতি ভ্রূকুটি করে মিনুর পায়ে হাল্কা চাপড় মারে, জিভ বার করে দেখায়। নতুন-শেখা 'যাঃ যাঃ যাঃ' কথা দিয়ে মিনুও মায়ের প্রতি যথারীতি উষ্মা প্রকাশ করে। নিজের র‍্যাপারটা দিয়ে মিনুর দেড় বছরের শরীরটা ঢাকা দিয়ে অজিত কন্যারত্নকে রোজকার মত বিখ্যাত সেই কাবুলীওয়ালার ভঙ্গীতে আদর শুরু করে 'আমার খোঁকি বড় হবে, শ্বঁশুরবাড়ী যাবে' ইত্যাদি। সর্দিতে নাকটা বোঝাই থাকায় নাকিসুরের উচ্চারণ নিখুঁত শোনায়। বাজারের থলি উপুড় করে আনাজপাতি চুপড়ীতে সাজিয়ে রাখতে রাখতে প্রীতি বলে 'শ্বশুরবাড়ী যাবে না আরও কিছু। কে তোমার ঐ নাকখেঁদা মেয়েকে বিয়ে করবে শুনি?' অজিত হাসিমুখে কথার খোচা দেয় 'আমারই মত এই বেঙ্গল থেকে খ্যাঁদা-নাক-প্রীতির কোন উদার হৃদয় ইয়াংম্যানকে নিশ্চয়ই খুঁজে পাওয়া যাবে'?

'ইস্, আমি বুঝি খ্যাঁদা! বলুক তো কোন শত্তুরে বলবে?'

এখন সহজেই ধরে নেওয়া যায় যে প্রীতির নির্দেশ মত আপাততঃ টিউশানীর জন্যে বাইরে যাওয়ার ব্যাপারটা আজকের জন্যে স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত অজিত নিয়ে ফেলেছে। কিন্তু অফিস যেতেই হবে। একাউন্টসের বিল ব্রাঞ্চের এ্যাসিস্ট্যাণ্ট—সোজা কথায় অপেক্ষাকৃত দায়িত্বপূর্ণ মাছি-মারা কেরাণী। পে বিল তৈরীর এই সময়টা কামাই করা মানে স্টাফের মাইনে আটকে যাওয়া এবং যার অনিবার্য ফল হল কর্তৃপক্ষের কাছে উপযুক্ত কৈফিয়ৎ দেবার দায়ধাক্কা এবং মারমুখী স্টাফের চামড়া খুলে নেওয়ার হুমকী ইত্যাদি। সুতরাং প্রীতির ক্ষিপ্রহস্তে যথারীতি রান্নাবান্না চলে এবং শেষ হয়। স্নানটানের প্রশ্ন ওঠেই না, হাতমুখ ধুয়ে অজিত খেতে বসে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খানিকটা ঘি শিশি থেকে ভাতে ঢালতে ঢালতে প্রীতি বলে, 'মনে হচ্ছে,

মশাই না হলে যখন অফিসই চলবে না তখন দয়া করে ওষুধের দোকান থেকে গোটাতুই পেন্‌টিড ফোরহানড্রেড কিনে অফিসে গিয়েই যেন গরম চায়ের সঙ্গে খেয়ে নেওয়া হয়। নাকের জল-ঝরা কমবে শরীরটাও ঝরঝরে থাকবে। তাছাড়া একটু তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরলে আরো অনুগৃহীত হই।' নিত্য প্রয়োজনের কয়েকটা ওষুধপত্তরের নাম প্রীতির ঠোঁটের ডগায় ঘোরে। ভাববাচ্যে কথা বলার ধরণ শুনে অজিত প্রীতির মনের উদ্বেগ ও উষ্মার আঁচ পায়। সুতরাং এরপর সে 'হ্যাঁ' 'ঠিক আছে', 'আচ্ছা' ইত্যাদি চালিয়ে যায়।

কিন্তু একটা সাংঘাতিক অনুরোধের বিপদ ওৎ পেতে অপেক্ষা করছে অজিত বুঝতে পারে না। হাতমুখ ধুয়ে একমাত্র শোবার ঘরে ঢুকে জামাকাপড় পরতে গিয়ে ছাখে প্রীতি আলনা আটকে দাঁড়িয়ে আছে। মেঝেয় মাতুরে মিনু বাঘ সিংহ নিয়ে খেলায় ব্যস্ত। পরবর্তী পর্যায়ে যে কোন ব্যাপারে হ্যাঁ বাচক কিছু বলে গিন্নীকে খুসী করার প্রস্তুতি মনে মনে চালিয়ে অজিত কৃতাঞ্জলীপুটে বলে 'দেবী এক্ষণে এমত আচরণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করুণ।'

'যা বলি শুনবে?'

'নিশ্চয়ই'।

'আমাকে ছুঁয়ে বল'

অজিত সুযোগটায় সদ্ব্যবহার করে প্রীতিকে জড়িয়ে ধরে। মিনু 'যাঃ যাঃ যাঃ' সময়মত প্রয়োগ করে বাঘ সিংহের ওপর থাবড়া মারে। প্রীতি তুহাত দিয়ে অজিতের কোমর জড়িয়ে ধরে বলে ''বুকখোলা ছেঁড়া সোয়েটার পরে আজ তোমার অফিস যাওয়া চলবে না। ভীষণ ঠাণ্ডা পড়েছে, অসুস্থ শরীর, তোমার স্যুটটা বার করে দিই, পরে যাও। এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না।' অজিত ছিট্‌কে সরে যায়, বলে 'পাগল হয়েছো। ঐ দামী স্যুট পরে অফিস গেলে আর রক্ষ্যে আছে, পাঁচজনকে কৈফিয়ৎ দিতে দিতে প্রাণান্ত হবে। কলিগ্‌দের টাকা টিপ্পুনিতো আছেই অফিসাররা ভাববে অডাসিটি,

আমার অসুখ আরও বেড়ে যাবে। তাছাড়া আমার নিজেরও কেমন অস্বস্তি লাগে—মনে হয় ট্রামে-বাসে-অফিসে সবাই বুঝি আমার সং দেখছে।'

প্রীতির মেজদা মিলিটারী ক্যাপটেন, মেজাজী লোক। ওদের ভাব করে বিয়ে করার ব্যাপারটা তিনিই একমাত্র উদারভাবে গ্রহণ করে ভাইজ্যাক্ থেকে চিঠিতে তাদের আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন এবং সেই সঙ্গে পাঠিয়ে ছিলেন প্রীতির জন্য 'কাঞ্জিভরম' আর অজিতের জন্যে মূল্যবান টেরীউলের অলিভগ্রীন স্যুটের পীস্। প্রীতির তাগিদে সদ্য সদ্য একশ কুড়ি টাকা দিয়ে 'আসলাম' থেকে স্যুটও বানানো হয়েছিল। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। স্যুটটা পরতে অজিতের প্রবল অনীহা। যদিও কালেভদ্রে সিনেমাটিনেমাতে গিয়েছে তবুও বাড়ী ফিরে ওটা খুলে ফেলে তবে যেন সে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। এই খাপ-না-খাওয়া ব্যাপারটা প্রীতি বোধহয় আস্তে আস্তে বুঝতে পারে, আর পীড়াপীড়ি করে না। খুব ঠাণ্ডাফাণ্ডা পড়লে মুখে এক-আধবার বলে, অজিত অন্য কথা দিয়ে সেটা চাপা দেয়। এইভাবে ওদের ছটা শীত পার হয়ে গেছে। প্রথম দিকে অন্য গরম জামাকাপড়ের সঙ্গে ওটাকেও এক আধবার রোদ্দুরে দেওয়া হত। কিন্তু গত কবছর ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায় সেটির অবস্থান প্রীতির স্টিল-ট্রাঙ্কের একেবারে নীচে।

আজ প্রীতিকে যেন একটা জেদ পেয়ে বসেছে, 'তাহলে আজকাল আমার গা-ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেও তার কোন মূল্য নেই তোমার কাছে।' প্রীতির মুখ অভিমানে আরক্ত, দুচোখ ছাপিয়ে জলের ধারা। ব্যাপারটা অন্যদিকে গড়াচ্ছে, অসহায় অজিত এখন বেপরোয়া, বলে, 'বার করতো দেখি, আজ ওটাকে শায়েস্তা করবো, শুধু অফিস কেন টালা থেকে টালীগঞ্জ পর্যন্ত স্যুটেড্ হয়ে ঘুরে আসবো।' চোখে জল, মুখে হাসি নিয়ে প্রীতি তক্তপোষের নীচ থেকে ট্রাঙ্কটা টেনে নেয়। চাবি খুলে কাপড় চোপড় সরিয়ে প্যাকেটটা বার করে বিছানায় রাখে। কিন্তু তার মুখের সদ্য-ফোটা হাসিটুকু মুহূর্তেই মিলিয়ে যায়। দুহাতে

কোট এবং ট্রাউজার নিয়ে চকিতে সে জানলায় আলোর সামনে মেলে ধরে আর কয়েক গজ দূর থেকেও অজিত টেরিউলের প্রতি সেন্টি-মিটার দূরত্বে বিন্দু বিন্দু আলোর সংকেত দেখতে পায়। তারপর আর একবার নিঃশব্দে ট্রাঙ্ক খোলা হয়, অলিভগ্রীন টেরিউলের অভিজাত স্যুট অপ্রিয়ের সঙ্গ এড়িয়ে ট্রাঙ্কের অন্ধকার-আনন্দে মিশে যায়, আর প্রীতি নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে চলে যায়।

———

রাস্তা মেরামত হইতেছে

[গল্প-লেখক শ্রীযুক্ত প্রাণতোষ ঘটকের একটি সৃষ্টি-প্রচেষ্টার ব্যর্থতা, অভিজ্ঞান ও আত্ম-উন্মোচন]

'কৃতবিদ্য' শব্দটার লাগসই মানে (প্রতিশব্দ) জানার প্রয়োজনে 'চলন্তিকা' হাতড়াচ্ছিলাম—সঠিক্ পৃষ্ঠায় পৌঁছোতে দেরী হচ্ছিল, গলির হদিস্ পাবার পর সঠিক নম্বর খুঁজে না পাওয়ার মত বিরক্তিকর অবস্থা। নেড়ার মা অর্থাৎ আমার সহধর্মিনী ঘরে ঢুকে খানিক এদিক ওদিক, তারপর ময়ূরমার্কা তিলতেলের শিশিটা খুঁজে পাবার পর 'শুনছো, কাল রাতে সুকুমারের একটা ছেলে হয়েছে, তিনদিন ধরে ব্যথা খেয়ে বউটা মরমর হয়েছিল, ডাক্তারে পেট ফালাফালা করে গর্ভের শয়তানটাকে বের করেছে, মাগো ভাবতেই গা শিউরে ওঠে। এই ছেলেরাই বড় হয়ে বাপমাকে...' ইত্যাদি সংবাদ-সংলাপে আমি উৎসাহিত হই না। আমার বড় ছেলে নেড়া, যার ভাল নাম অক্ষয় এবং তার আরও তিনটি ভাইবোন কেউই তাদের মাকে ঐরকম সাংঘাতিক কোন কষ্ট না দিয়ে এই কলকাতার জনসংখ্যা বাড়িয়েছে, সে কথা বলা বাহুল্য। এই মুহূর্তে একটি সাপ্তাহিকের জন্যে পঞ্চাশ টাকা দক্ষিণার তাগিদে পাতাপাঁচেকের একটি গল্প-প্রসব ব্যাপারে মাথা ঘামানোই আমার মাথাব্যথা। সুতরাং আধশোয়া অবস্থাটা পাল্টে উবু হয়ে বসে, অনেকক্ষণ খাপ্‌খোলা থাকার জন্য কালি শুকিয়ে যাওয়া পেনটাকে বারকতক ঝেড়ে নিয়ে নতুন প্যারাগ্রাফ্‌টা আরম্ভ করার আগে অভ্যাসমত চারমিনার ধরিয়ে সদ্য লেখা অংশটা পড়ে নিচ্ছিলাম এবং পরবর্তী ভাবনায় গেরো বাঁধার সঙ্গে সঙ্গে একটু রিল্যাক্স করাও হচ্ছিল।

ইতিমধ্যে আইডিয়াও প্রায় যুগিয়ে গেল, ছাই আর দেশলাই-এর পোড়া কাঠি ভর্তি এ্যাসট্রের ওপর জ্বলন্ত সিগারেটটা ঠেক্ দিয়ে গল্পের

তিনশো টাকা মাইনের অবিবাহিত ত্রিশোর্ধ নায়ককে ছম করে একেবারে 'সংসার সীমান্তে' নিয়ে ফেলব এবং 'হারমোনিয়াম্' বাজাব কিনা ভাবছি, এমন সময় আমাদের নবকৃষ্ণ গুঁই সেকেণ্ড বাই লেনে 'লোড্‌সেডিং'—যেন ছানিপড়া টিম্‌টিমে দৃষ্টির হেঁপোবুড়োর চোখ থেকে তেলচিটে চশমাটা জোর করে কেড়ে নিয়ে একটা লেংগি মারা হল। প্রায়ান্ধকারে স্কুলে যাওয়ার আয়োজনে টেবিল হাতড়ে বই খাতা জ্যামিতির বাক্স গুছিয়ে নিতে নিতে আমার মেয়ে 'সান্নু' যার ভাল নাম সান্ত্বনা, 'বাপি, সাড়েন'টা বাজে, জল চলে যাবে, মা তোমায় স্নান্ করে নিতে বললে। রোজকার এই তাড়া-লাগানোর কাজটা সান্নুর কাছে নৈমিত্তিক দায়সারা গোছের। সুতরাং আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই ও'র চলে যাওয়ার কথা। অথচ না গিয়ে এক ধরনের অনুচ্চ উত্তেজক স্বরে, 'জানো বাপি, আমাদের ক্লাসের ফুল্লরার মেজদাকে 'মিসায়' নিয়ে গ্যাছে—আনন্দমার্গ করত, পুলিশ ও'র ঘরে মানুষের মাথার খুলি পেয়েছে।'

'তোমাকে ওসব ব্যাপারে মাথা ঘামাতে কে বলেছে মা মনি? খবরের কাগজওয়ালারা যখন রয়েছে……।'

'মাথা ঘামাতে যাব কেন, ক্লাসে সবাই বলাবলি করছিল—ফুলুও ক'দিন স্কুলে আসছে না তাই'—আমার নিরুৎসাহে সান্নু বেশ বিরক্ত, বোঝা যায়। 'সবেতেই তোমার বেশী বেশী', সে ঘর ছেড়ে চলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে আমার ভাবনার স্টিয়ারিং এগিয়ে যায় মোক্ষম এক মোড়ে —নায়ককে 'মিসায়' দিয়ে গল্পে এক জবর সাম্প্রতিক বাস্তবের ধাক্কা দেওয়া যায়। আজকাল অনেকেই সংসারের সার বুঝেছে, তাই জটিলতা এড়াতে 'প্যায়সা ফেকো তামাসা দেখো' পন্থী, ব্যাপারটায় তেমন অভিনবত্ব আর নেই—স্রেফ্ জল ভাত হয়ে গ্যাছে। শরৎচন্দ্র থেকে সমরেশ পর্যন্ত বারোয়ারী মেয়েদের রকমারি গল্পের আস্বাদ না পেয়ে বিদগ্ধ সাহিত্যরসিক হতে পেরেছেন এমন ক'জন আছেন! তা ছাড়া আজকাল তো 'বারবধূ' গল্পে-নাটকে পাড়ায় পাড়ায়। বিশিষ্ট

মাসিক পত্রিকা সগৌরবে 'বারবধূ' সংখ্যা প্রকাশ করে, নাটকের বিজ্ঞাপন হয় 'দশ লক্ষ দর্শককে 'বারবধূ' দেখাতে চাই'। দেবদাস চুনীলালের সঙ্গে মাল খেয়ে চন্দ্রমুখীর ঘরে না চাঁপাদাসীর খুপ্‌রীতে উঠলো···আজকাল আর তেমন কাট্‌তি হচ্ছে না।

সুতরাং মার্কস-বিপ্লব-ভিয়েৎনামী 'গরম হাওয়া' ছাড়লে কেমন হয়। তারপরেই আঁৎকে উঠি, পাগল নাকি! এই মাগ্‌গীগণ্ডার বাজারে তিনশো টাকার চাকরী করা নায়ককে দিয়ে নকসাল-আনন্দ-মার্গ করাবো, মিসায়' দেবো—মামদোবাজী! বাড়ীতে মাথা গোঁজার প্রয়োজনে রাতটুকু পাড়ায় থাকা, মুখ সেলাই করা নির্দল ভালছেলে নায়ক দশটা পাঁচটা অফিস করে। বড় জোর বামপন্থী ইউনিয়নের ডাকে ডি. এ. বাড়ানোর আন্দোলন সামিল হয়ে এক আধদিন ধর্মঘট্-টট্ করে ফ্যালে, তারপর কর্তৃপক্ষের শাস্তির সার্কুলারের চাপে 'ছুটির দরখাস্ত' বা মুচলেখা দিয়ে পিঠ বাঁচায়। বিকালে ময়দান-সিনেমা আউট্‌রাম, বড় জোর শনিবারটায় বন্ধুদের সঙ্গে 'শেয়ারে' এক আধ 'পেগ্' মেরে কিছুটা বেপরোয়া—একটু বেশী রাতে বাড়ী ফিরে 'খেয়ে এসেছি' বলে নিজের ঘরে খিল্ দিতে পারে।

সুতরাং এক্ষেত্রে শ্রীমানের চাকরীটা খতম করতেই হয় অর্থাৎ শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা আমাকে আর একটি বাড়াতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ চমকের মত আমার এক ভ্রাতৃস্থানীয় শ্রীমান অংশুমান-এর (পাড়ায় গ্রাজুয়েট মাস্তান) রসিকতা তথা সাবধানবাণী মনে পড়ে যায়, যা বাস্তবিক আমাদের এই লাইনের সকলেরই ভাববার কথা। সেদিন বাড়ী ফেরার সময় রাস্তার মোড়ে, 'এই যে প্রাণতোষদা, কেমন আছেন—নতুন কি লিখলেনটিখলেন?'···দলবল সহ অংশুমানের কবলে। লেখক হিসেবে ওরা আমাকে কিছুটা সমীহ করে, অন্ততঃ এ পর্যন্ত না করার কোন নজীর দেখিনি এবং সেই ভরসাতেই বলি, 'এই আর কি—ভালই। তোমাদের খবর কি—পাড়ার হালচাল?' দলের অন্য একজন ইতিমধ্যে, 'দাদা চলুন, হ্যাপলার দোকানে চা খেতে

খেতে খানিকটা স-সাহিত্য আলোচনা করে আমাদের একটু কম্প্যানী দেবেন।' অংশু তাকে খিঁচিয়ে ওঠে, 'শা-শালা, মেশোমশাই-এর··· খাও না। দেখেছেন দাদা ভিক্ষে করে পেট ভরিয়ে হারামজাদাদের কেমন চরিত্তির নষ্ট হয়ে গ্যাছে, কার সঙ্গে কেমন করে কথা বলতে হয়, জানে না', তারপর আমার এক মোক্ষম প্রশ্ন, 'ওদের কথা ছাড়ুন, তা দাদা, এবার বলুন, আর কতগুলি বেকার বাড়ালেন?' আমি হতবাক, বলি 'বেকার······আমি বাড়াবো······আমি কি গভর্ণমেণ্ট না ফ্যাক্টরীর মালিক······কি বলছো হে?' 'আরে দাদা, ওই হলো, মানে বেকারদের নিয়ে রগ্‌রগে সহানুভূতি-মাখানো আর কতগুলি গল্প বাজারে ছেড়ে টু-পাইস্ হলো?' তারপর এক গাল হেসে 'একটা কথা কিন্তু আপনাদের লাইনের সকলকে জানিয়ে দেবেন যে আমাদের নিয়ে 'মাল' বানিয়ে পয়সা কামালে এবার থেকে আমাদের 'পার্সেণ্টেজ' ছাড়তে হবে, আমরা লিস্ট তৈরী করছি, মনে থাকে যেন? আচ্ছা দাদা, আজ চলি, কিছু মনে করবেন না যেন।' দলবলসহ অংশুমান চলে গেলে আমি বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে সেদিন ভেবেছিলাম, এই রকম তীক্ষ্ণধী রসিক ছেলেদের আমরা 'মস্তান' বলে আলাদা করি, ভয় পাই, এড়িয়ে চলি—এতো আমাদেরই 'ড্র-ব্যাক'—আসলে আজকের লেখক-নাট্যকার-পরিচালক, এই আমরা এক একটি 'ধাড়ী গিরেবাজ' তথা 'ফেরেব্বাজ' তথা 'নির্বোধ' (ব্যতিক্রমও আছে) যেমন আমি একটি 'অতি নির্বোধ' তথা 'মহামূর্খ' এমন গল্পের গরুকে গাছে তুলতে পারছি না আবার ভাগাড়েও ফেলতে পারছি না, ক্যাবলচন্দ্রের মত কলম কামড়ে বসে আছি, ভাবছি—ভাবছি, অথচ এগোতেও পারছি না এককদম্—যেন নাকের সামনে করপোরেশানের তেপায়া কাঠের স্ট্যাণ্ডের ওপর লট্‌কানো গোল চাক্‌তীতে লেখা—'রাস্তা বন্ধ, মেরামত হইতেছে।'

আমার তুমি ও লাবণ্য

তোমার চুমুর মিষ্টি-সোনালী গন্ধ আমাকে পাগল করে দিয়েছিল। তা না হলে কবে—আমার সেই দুরন্ত-কৈশোরে তোমার-আমার পরিচয়, আজও এমন নিটোল্ সখ্যতার মাধুর্যে মধুময় হয়ে থাকতো কেমন করে! সেতো আজকের কথা নয়, হিসেব করলে কুড়িটা বছর, সোজা নয়! রেশমের মত নরম সদ্যসাজানো গোঁফ্‌দাড়ির সম্পদ নিয়ে আমি তখন ফাষ্টক্লাসের ছাত্র, স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দেবো। স্কুলের সরস্বতীপূজো কমিটির একজন স্বভাবভীরু মেম্বার। পূজোর দিনের অবাধ স্বাধীনতার সুযোগ সে এক পরম লগ্ন—তোমার আমার প্রথম নিভৃত আলাপের ক্ষণ—স্কুলমাঠের প্রান্তে, জোড়া-খেঁজুরের জঙ্গলে। তখন ভরামাঘের বিকেল ফুরিয়ে সন্ধ্যে হয় হয়, কুয়াশার আস্তরণ মাটির কাছাকাছি, সর্ষেফুলে হিম জমতে শুরু করেছে। ঠিক তখনইতো 'সেদিন দুজনে মিলেছিনু বনে'—মনে পড়ে তোমার? এখন ভাবলে ভীষণ হাসি পায়। কি রোমান্টিক আর ভীতুই না ছিলাম আমরা। আমি সন্তর্পণে চারপাশ তাকিয়ে শুধু ভয়েই মরি, 'এই বুঝি কেউ দেখে ফ্যালে'। গলা শুকিয়ে কাঠ, বুকের টিপ্‌টিপুনীটা বেশ জোরে জোরেই যেন শোনা যাচ্ছিল। তারপর কিছুটা সামলে নিয়ে অনেক সাহস সঞ্চয় করে, সব সংকোচ আর দ্বিধা সরিয়ে তোমাকে কাছে টেনে নিয়ে আদরে সোহাগে ভরিয়ে দিয়ে···এক গভীর চুমু, তখন তোমার অবস্থা দেখবার মতো একেবারে আধখানা, লজ্জায় না ভয়ে, কিজানি!

তারপর অবশ্য তোমার প্রশ্রয় পেয়েছি। যতবার কাছাকাছি হয়েছি কখনও 'না' করোনি। কিন্তু ভয়তো ছিলই। তাই তখনও আমাদের ব্যাপারস্যাপার গোপনে, লুকিয়ে চুরিয়েই হোত। কিন্তু কপালে দুঃখ ছিল, প্রথম ধরা পড়লাম মায়ের কাছে। আসলে মায়ের

চোখকে ফাঁকি দেওয়া খুব শক্ত ব্যাপার। সামনে টেষ্ট পরীক্ষা, জোর কদমে পড়াশোনা করছি, রাতও জাগছি। কিন্তু তোমায় ছাড়া বাঁচিনে। তাই একদিন রাত্রে দুঃসাহসে ভর করে তোমাকে সঙ্গে নিয়েই এসেছিলাম পড়ার ঘরে। ভেবেছিলাম সবাই ঘুমিয়ে পড়লে তোমাকে একটু আদর করে, চাঙ্গা হয়ে বেশ মেজাজ করে পরীক্ষার পড়া চালাব-সারারাত। কিন্তু মা যে মাঝরাতে আমার খবরদারি করতে আসবেন তা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। ভাগ্যিস্ তুমি তখন সবেমাত্র চলে গ্যাছ! কিন্তু কাল হলো তোমার ঐ পাগল-করা মিষ্টি সোনালী গন্ধ। আমার ঘরে ঢুকে মা বাতাসের আঘ্রান নিয়ে তোমার সেই মধুর অনতি-অতীত অস্তিত্বের অনুমান করে নিয়ে শুধু শুয়ে পড়ার নির্দেশ দিয়ে গম্ভীর মুখে ফিরে গিয়েছিলেন। সারারাত ঘুম আর হয়নি। ভয়েই মরি, একি কেলেঙ্কারী, ধরা পড়লাম একদম মায়ের হাতেই, সুতরাং বাবার কানে উঠবেই—কি লজ্জার কথা! পরদিন যথারীতি বাবার মুখোমুখী হতে হলো। বাবা ভীষণ রাসভারী লোক, কোন দিনও মারধোর করেন না। কিন্তু ওঁর কথা বলার মধ্যে এমন একটা গভীর শব্দের শাসন থাকে যা শুনলে আমার হাত পা পেটের মধ্যে সেঁদিয়ে যায়। সুতরাং বলির পাঁঠার অবস্থা। বাবা বললেন 'তোমার মার কাছে যা শুনলাম তাতে আমি অবাক হয়ে ভাবছি তুমি এসব অসভ্যতা শিখলে কোথায়! এইটুকু বয়সে ওসব একদম ভাল নয়, মনে রেখো। লেখা-পড়া শিখে বড় হয়ে নিজের ইচ্ছেমত যা হয় কোরো, বাধা দেব না।' পালিয়ে এসে পড়ার ঘরে খুব কেঁদেছিলাম। মা এসে মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে, আদর করে কত কি বুঝিয়েছিলেন। কিন্তু যার হৃদয়ের সবটুকু সমর্পিতপ্রায় তাকে বুঝিয়ে আর কি হবে! তবু স্কুল ফাইন্যাল্ পরীক্ষার আগে পর্যন্ত কটা মাস বাবামায়ের অনুশাসন অগ্রাহ্য করে তোমার কাছা-কাছি হওয়ার ব্যাপারে আমার নৈতিকতায় কেমন বেজেছিল, তাই তোমার কাছ থেকে দূরে দূরেই সরিয়ে রেখেছিলাম নিজেকে। সেই

সময়টা আমার দুঃস্বপ্নের দুঃসময়, প্রচণ্ড বিরহের কাল। অবশ্য পড়াশোনায় ব্যস্ত থাকায় সময় গড়িয়ে যেত কেমন করে টের পেতাম না।

এরপর এল আমার জীবনের সেই উদ্দাম ঝড়ের তাণ্ডব—যেন সুইজারল্যাণ্ডে বসন্ত এল 'ড্যাফোডিল্' ফুলের হাসিতে, এলো পশ্চিমা বাতাস, শোনা গেল 'স্কাইলার্কের' গান—হ্যাঁ, এটা 'দি ওয়েষ্ট-উইণ্ড'এর, তুমি তো জানোই 'ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ' আমি কত ভালবাসি। স্কুল থেকে পাশটাশ করে কোলকাতায় হোষ্টেলে থেকে ইংরেজী সাহিত্যের ছাত্র হিসেবে কলেজ ইউনিভার্সিটির বেড়া ডিঙ্গিয়েছি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে এবং সসম্মানে। তারপর একটা নামী কলেজে অধ্যাপনা—সম্মান ও সম্পদ একসঙ্গে। বাবা মা খুব খুশী, তাঁদের কথামত লেখাপড়া শিখে বড় হয়েছি। কিন্তু তাঁরাতো জানেন না কি আমার সাফল্যের চাবিকাঠি, কে আমার অন্তরের প্রেরণা, কার নিত্য সাহচর্যে আমার যৌবনের পাগলাঘোড়াটা এমন টগবগিয়ে ছুটছে! সেতো তুমিই—তোমার মিষ্টি সোনালী গন্ধ যা আমাকে পাগল করে রেখেছে।

মানুষের সবদিন সমান যায় না। আমার জীবনেও দুর্যোগ ঘনিয়ে এলো। বঙ্কিম বলেছেন, 'বাল্যপ্রেমে বুঝি অভিসম্পাত আছে। কাঁটার আঘাত তাকে সইতেই হয়।' আমার বিয়ের সম্বন্ধ এলো। পাত্রী সদ্বংশজাত, বাংলা-অনার্স-সুন্দরী—নাম লাবণ্য। যার লাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে বাবা মা, আমার বিয়ের দিন স্থির করে আমাকে ফেললেন এক গভীর সমস্যায়। দ্বিধা, সংশয় এবং দুর্ভাবনার মধ্য দিয়ে সেই মারাত্মক দিনটা এগিয়ে এলো। আমার আর কোন উপায় ছিল না। বিয়ের পিঁড়িতে বসলাম, স্থির করলাম লাবণ্যের কাছে তোমার কথা কিছুই গোপন করব না—সবকিছু পরিষ্কার হওয়াই ভাল। ফুলশয্যার রাতে তোমাকে সঙ্গে নিয়েই লাবণ্যের কাছে হাজির হলাম, পরিচয় করিয়ে দিয়ে তোমারআমার নিবিড় সম্পর্কের কথা জানিয়ে তার মনোভাব জানার জন্যে দমবন্ধ করে অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু

লাবণ্য মনের দিক থেকেও লাবণ্যময়ী, সংস্কারমুক্ত, আধুনিকা—হাসি-মুখে বলল 'ও' তোমার অনেকদিনের, সুতরাং ওকে ত্যাগ করার কথা বলতে আমার বিবেকে বাধে। তাছাড়া পুরুষমানুষের এমন একটু আধটু দোষটোষ থাকা আমার ভালই লাগে। ও তোমার কাছেই থাক আমার আপত্তি নেই। আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম, নির্লজ্জের মত লাবণ্যের সামনেই তোমাকে চুমু খেয়ে বসলাম। তোমার মিষ্টি সোনালী গন্ধ লাবণ্যেরও মন্দ লাগেনি।

তারপর থেকে আমরা তিনজনেই ঘরকন্না করেছি একসঙ্গে, ঠোকাঠুকি তো দূরের কথা, তোমার চুমু আর লাবণ্যের নিষ্ঠা আমাকে সাহিত্যের 'ডক্টরেট' বানিয়েছে। আমাদের কোলে 'ঝুমা' এসেছে—তর্‌তরিয়ে সোনারতরী এগিয়ে চলেছে। কিন্তু দিন কখনও সমান যায় না, সুখের পর আসে দুঃখ, যেমন দিনের আলো ঢাকা পড়ে রাতের কালো অন্ধকারে। বেশ কিছুদিন গলাব্যথা, জ্বর ও কাশিতে দুর্বল হয়ে লাবণ্যের জোর তাগিদে প্রথমে সাধারণ ডাক্তার তারপর স্পেসালিস্ট এবং সবশেষে চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের অমোঘ নির্ণয়…থ্রোট ক্যানসার, প্রাইমারী স্টেজ—ভালও হয়ে যেতে পারি।

ডাক্তারদের অভিযোগ 'এ নাকি তোমাকে বেশী রকমের আদিখ্যেতা দেখানোর মারাত্মক পরিণতি।'

বর্তমানে 'তোমাকে' কাছে পাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না, কারণ, এখন যে আমি সম্পূর্ণ ওদের মানে ডাক্তারদের কব্জায়—চিত্তরঞ্জন ক্যানসার হস্‌পিটালের 555 নং বেডের পেসেন্ট্‌। বিকালে ভিজিটিং আওয়ারে লাবণ্যকে তবু ওরা আসতে দেয় কিন্তু তোমার ব্যাপারে ওদের প্রবল অনীহা। হাসপাতালের কাঁচের জানলার ফাঁক দিয়ে, সারাদিন ধরে, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোডের চলমান 'ডবলডেকারের' দেওয়ালে তোমার শুভ্র রূপের মাধুরী দেখে স্মৃতিতে কত কথা ভীড় করে—আমার মধুর কৈশোর—উদ্দাম যৌবন—সুখী দাম্পত্য তোমার মিষ্টি-সোনালী গন্ধের, তোমার সাহচর্যের উষ্ণ উত্তাপের মুহূর্ত দিয়ে ভরপুর।

তোমার কথা ভাবতে ভাবতে রাত আসে, ঘুমিয়ে পড়ি, দিনের জাগরণের প্রহরে কল্পনায় বেপরোয়া হ'য়ে এখান থেকে পালিয়ে গিয়ে তোমায় নিয়ে কোন নির্জন সমুদ্রতটে হাজির হই, যেখানে শুধু তুমি আর আমি—যেন তোমার চুমুর মিষ্টি সোনালী পরশ আর গন্ধের উত্তাপ নিয়ে আমি ক্ষণে ক্ষণে হারিয়ে যাই—ফুরিয়ে যাই। তোমায় হারিয়ে আমার এই বেঁচে থাকা যে কত কষ্টের, কত যন্ত্রণায় তা এরা কেউ বুঝবে না। শুধু লাবণ্যই আমায় বোঝে, তবু তো সান্ত্বনার জন্যেও বলে, 'তুমি ভাল হয়ে যাও, তারপর আবার ঐ 'মুখপুড়ী সিগারেট-সর্বনাশীকে' আমি নিজের হাতে তোমার ঠোঁটে তুলে দেব, কথা-দিলাম।' লাবণ্য 'প্রেম' যেমন জানে, তেমনি বিচ্ছেদ যে কি, তাও গভীরভাবে অনুভব করে।

একদা সুখের খোঁজে

কোথাও আনন্দ নেই, কিচ্ছু ভাল লাগে না তন্ময়ের, 'সব মিথ্যে, শুধুই গোঁজামিল'। এই মাটি-আকাশ লোকজন, সবকিছু পুরোনো মরচে পড়া টিনের স্তূপের মত মনে হয় তার। বেশ কিছুদিন ধরে তন্ময় অনুভব করছিল যেন একটু একটু করে সে ফুরিয়ে যাচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে। কেমন যেন এক ধরনের বিষণ্ণতা আর হতাশার শিকার হয়ে পড়ছিল সে। তার ভাললাগা, স্নেহ-কোমলতা, সবকিছু বুঝি ভোরের ক্লান্ত শিউলির মত একে একে ঝরে পড়ছিল। মরিয়া হয়ে গোঁয়ারের মত অন্ধ আবেগে কত গৃহকোণ-রাজপথ-কাণাগলি-আবর্জনা-শুঁড়িখানা-দেবালয় তন্নতন্ন করে খুঁজে বেড়ালো সুখের নেশায়, আনন্দের আশায়। নাঃ কাদামাখাই সার হলো। মরা-সমাজের গোলামী করে তার জীব-জীবনের তিরিশটা বছর কেটে গেল। মাথার চুল পাতলা হতে আরম্ভ হলো, মেজাজ হলো রুক্ষ, মন সন্দিগ্ধ। এমনভাবে আর কিছুদিন চললে হয়তো তন্ময়কুমার চট্টোপাধ্যায় আজকের দিনের উপযোগী একটা ছাঁচে ঢালাই বাস্তববাদী মানুষ-যন্ত্রে পরিণত হোত। ঠিক এই সময়েই সে মিলুকে দেখল, চিনলো।

ঝড়বৃষ্টির সন্ধ্যায় অফিস ফেরৎ লোকজনের গাদাগাদির মধ্যে ট্রামের খোলা জানলার ধারে এক কোণে বৃষ্টিজলে ভিজে ঠাণ্ডায় মিলুর পাতলা ঠোঁটদুটো কাঁপছিল। তারপর স্টেশনের পথে সাবওয়ে—কয়েক হাজার লোকের ধাক্কাধাক্কি-চাপাচাপি-ঘাম-বন্যতার মধ্যে তন্ময় তাকে দেখলো অসহায়—বিষণ্ণ। সে অনুভব করলো একটা তাগিদ—একটা প্রসস্ত পথ···সমবেদনার। ছুরির ফলার মত বৃষ্টির ঝাপটা চোখে-মুখে। নিঃসঙ্কোচে এক অজানা যুবতীর হাত ধরে, কখনও দেহের আড়াল করে পথচলা, ভিজেশাড়ী-ট্রাউজার, সিগারেটের অভাব, ট্রেনের ঠাণ্ডা হাওয়ায় কাঁপুনি, তারপর কৃতজ্ঞতা-ধন্যবাদের আর্দ্র জমিতে আলাপের অংকুরোদগম:

: ঝড়বৃষ্টির দিন একটু তাড়াতাড়ি অফিস থেকে বেরিয়ে পড়তে পারতেন।

: না, মানে এমন বৃষ্টি হবে বুঝতে পারিনিতো…

: শর্মিলা মিত্র—ডাক নাম মিলু, আপনার…

: থারটিন্ বাই টু, মিশন রো একস্‌টেনশন

: স্টেশন এসে গেল আমার। সত্যি আপনি অনেক উপকার করলেন, যা অসুবিধায় পড়েছিলাম।

: চলুন, আপনাকে বাসে তুলে দিয়ে আসি, অনেক রাত হয়েছে

: না না আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না, আমি ঠিক…

: এমন কি কষ্ট হবে, চলুন।

: বাস নেই, এই রিক্সা কত ভাড়া… ঠিক আছে দিদিমণিকে সাবধানে পৌঁছে দিও।

: আবার কবে দেখা হবে?

: কালকেই ফোন করবেন,

: ঠিক আছে, সাবধানে যাবেন।

: আচ্ছা

সেদিন রাতে তন্ময় চ্যাটার্জী অনেকদিন পরে ছেলেমানুষের মত 'ঝড়ের উপহার' কবিতাটা লিখে ফেললো। অনুভব করলো অনেক দিনের অচল ঘড়িটায় আবার দম পড়ে চলতে শুরু করেছে। ঘুমিয়ে পড়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত সে একটানা ভেবে চললো—তার এই যে আবেগময় উত্তেজনা, এটা কিসের—কেন? হঠাৎ কি একটা যুবতী দেহের লোভ নাকি সেই পুরোনো কলেজি রোমান্স। তাতো নয়। তবে কিসের এই জ্বলে ওঠা—কেন এই বর্ণময় বৈচিত্র্য? ভোরের প্রথম ঘুম ভাঙ্গা মুহূর্তে তার মনে হলো মিলু বুঝি স্থলপদ্মের পরাগ, অনেক উঁচু ডালের দূরত্ব কমিয়ে দিয়ে কালকের ঝড় অনেক কাছাকাছি এনেছে তাকে, মনের অনামিকায় তন্ময় স্পর্শ করেছে তার সুগন্ধকে। এই বুঝি সুখ কিংবা আনন্দ যা সে খুঁজছিল এতকাল হাহাকারে—যন্ত্রণায়।

সেদিন ওরা তুজনে বসেছিল ময়দানে, ঘাসের উপর। বিকালের সোনালী রোদ্দুরে ওদের বেশ সতেজ দেখাচ্ছিল। সারাদিন ওরা নিজের নিজের অফিস করে এসেছে। তন্ময় বলছিল কেমন করে সে এতদিন হাজার মানুষের ভীড়েও নিঃসঙ্গ একাকীত্ব বোধ করেছে। পড়াশোনার পাঠ চুকিয়ে চাকরী পাবার পর এই কলকাতার ক্লান্ত-একঘেয়েমির মধ্যে, ট্রাম-বাস, ঘাম-ভীড়, স্বার্থপরতা-মিথ্যের মধ্যে দীর্ঘ সাতটি বছর কাটিয়ে দিয়েছে। মিলু নিঃশব্দে শুনছিল তার কথা, তন্ময়কে বুঝতে চাইছিল আরও অনেক বেশী করে। তার সবে আটমাসের চাকরী। ঠিক একবছর আগে তার বাবা অমরবাবু হঠাৎ থ্রম্বসিসে মারা যাওয়ার পর অফিস কর্তৃপক্ষ তাদের অবস্থা সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করে এবং তিন মাসের মধ্যেই তার চাকরীর নিয়োগ পত্র আসে। ভাই বোনদের মধ্যে সেই বড়, একটিমাত্র ভাই—সবচেয়ে ছোট। মিলু তখন হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করে কলেজে ঢুকেছে। তার পরে তিন বোন—মিঠু, দীপু, তনু। বাবার মৃত্যু তাদের আনন্দের সংসারটিকে হঠাৎ যেন স্তব্ধ করে দিয়েছিল। মিলুই প্রথম শক্ত করেছিল নিজেকে, একরাশ কান্নাকে বুকে চেপে রেখে মাকে সান্ত্বনা দিয়েছিল 'মা, তোমার ভয় কি? আমিতো রয়েছি, আমাকে তোমার বড় ছেলে ভেবে নাও। তোমাদের সবকিছু দায়ীত্ব আজ আমি মাথায় তুলে নিলাম। দেখো, আমি ঠিক চালিয়ে নিতে পারবো'। তারপর চাকরী, মাত্র আটমাসের। যে মিলুকে অমরবাবু আদরে স্নেহে চোখের মণি করে রেখেছিলেন, যার ফ্রকটুকু পর্যন্ত নিজের হাতে কেচে দিতেন তাকেই আজ ট্রাম-বাসের ভীড় ঠেঙ্গিয়ে দশটা-পাঁচটা করতে হচ্ছে। হাজার ক্লান্তির মধ্যেও আজ মিলুর মুখে পরিতৃপ্তির হাসি—সে মাকে নিশ্চিন্ত করতে পেরেছে। মিঠু কলেজে পড়ছে, দীপু, তনু, মণি স্কুলে।

মিলুর কথাগুলো ছবি হয়ে তন্ময়ের মনের গভীরে একে একে সাজান হচ্ছিল। সে মিলুর জন্যে একটা উদ্বেগ বোধ করছিল, মিলুর জীবনের পরবর্তী দৃশ্যগুলো তার কাছে খুব পরিচিত। এই সহজ সরল

মিলুকে নিয়ে এবার খেলা শুরু হবে। তার আশেপাশে চারিধারে সরীসৃপের মত ছাঁচেঢালা মানুষগুলো লোভ আর জটিলতার আবর্তে তাকে পাক খাইয়ে আঘাত দিয়ে শক্ত করে তাদের উপযোগী করে তুলবে। নিষ্পাপ কোমলতার খোলস্.ছেড়ে দিয়ে এই মিলু একদিন তার অফিসের এক টিপিক্যাল 'মিস মিট্রা' হয়ে উঠবে। সেদিনও সে হাসবে কিন্তু সেই হাসি আর আজকের হাসির তফাৎ থাকবে অনেকখানি। তন্ময় মনে মনে ঠিক করল অন্ততঃ একজনকে—এই মিলুকে সে প্রাণপন শক্তি দিয়ে আগলে রাখবে, একে হারিয়ে যেতে, ফুরিয়ে যেতে দেবে না কিছুতেই।

মিলু ঘড়ির দিকে চাইলো, 'ইস্-স্ পাঁচটা বাজে, ওঠ-ওঠ, শনিবার আজ, সকাল সকাল বাড়ী ফেরার কথা, মা আমাকে ভীষণ বকবে।' তন্ময় জানে মিলু অকপট, তার বাড়ী ফেরা নিয়ে মায়ের এই যে দুশ্চিন্তার বাড়াবাড়ি ওটা তাঁর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। পিতৃহীন-অভিভাবকহীন সন্ত-চাকুরে অল্পবয়েসী মেয়ের মায়ের মানসিক অবস্থার কথা সে অনুভব করে।

তন্ময় বিপদে পড়লো মিলুর হঠাৎ অনুরোধে। তাকে আজই এই সন্ধ্যায় তাদের বাড়ী যেতে হবে, মিলু তাকে ভাই বোনদের সঙ্গে, মার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে, নিজের হাতে চা খাওয়াবে ইত্যাদি। তন্ময় প্রথমে তার ছেলেমানুষীকে আমল দেয় না বলে 'আজ থাক, অন্য একদিন যাবো।' প্রথমে অভিমান তারপর আঘাতের মলিনতা চোখে-মুখে—মিলু বলে, 'বিশ্বাস করো, তোমায় ছুঁয়ে বলছি, আমাদের বাড়ীতে তোমার কোনোরকম অসম্মান হবে না,' চোখে তার অশ্রুর আভাষ। যুক্তি-বুদ্ধি মূল্যহীন হলো, তন্ময় এইখানে পরাজিত, বলল, 'চল!' মিলু তন্ময়ের হাতটা বেশ চেপে ধরে ট্রেন থেকে নামল। তন্ময় বুঝল তার সব কিছু পরম নিশ্চিন্তে এই মিলু…শর্মিলা মিত্র নিজের করে নিয়েছে।

'এই আমাদের বাড়ী, এস, ভেতরে এস'। মিলুর পিছুপিছু এক

অচেনা বাড়ীতে প্রথম আগমনে, দুরুদুরু উত্তেজনা, কিছুটা অস্বস্থায় কৌতূহল নিয়ে তন্ময় এগিয়ে গেল। মিলু রান্নাঘর থেকে মাকে হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে এল, বলল, 'মা, এই হলো তন্ময়দা।' তারপর তন্ময়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এবার আপনি বলুন, আপনি কে, আপনার সঙ্গে কেমন করে আমাব পরিচয় হলো।' তন্ময় অবাক হলো তার অকপট বুদ্ধিমত্তায়। কথা বলার সব দায় সে তন্ময়ের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে সহজ হলো, কোন ফাঁক নেই, সুযোগ নেই ছলনার কিংবা মিথ্যের। সত্যের পথ কত সহজ ও সরল অনুভব করল সে তখনই। ভদ্রমহিলাকে প্রণাম কবে একে একে তাদের আলাপের পর্ব থেকে নাম-ধাম, বাবা-মা-ভাই-বোন, শিক্ষা চাকরী, শেষে খুঁটিনাটি গল্প এ-বাড়ীর ওবাড়ীর, কোথা দিয়ে দুঘণ্টা কেটে গেল তন্ময় বুঝতেই পারলো না। মিঠু কলেজের পড়াশোনার গল্প, সিনেমা থিয়েটার, রবীন্দ্রসংগীত, রাজেশ খান্নার বিয়ের খবর বলল একমুখ সহজ হাসি নিয়ে। মিঠু যেন একমুঠো যুঁইএর সৌরভ। দীপু চা নিয়ে এল···বড় লাজুক, চায়ের কাপ হাতে দিয়ে মাথা নীচু করে দাঁড়াল। তন্ময় বললো 'বিউটিফুল'। 'ওমা, কি অসভ্য' দীপু ছুটে ঘর থেকে পালিয়ে গেল। তনু আর মণিময় প্রথম থেকেই তন্ময়ের পাশে বসে গল্প গিলছিল শেষ দিকে কখন যেন তারা তন্ময়ের হাতের আঙ্গুল মট্‌কে দিতে আরম্ভ করেছে নিজেদেরই অজান্তে। এ্যালবামে বাবার মৃত্যুর সময়ের ছবিটা দেখিয়ে মিঠু তার বাবার কথা বলছিল। সৌম্য শান্ত অমরবাবুর সেই মূর্তিকে তন্ময় তার মনের এ্যালবামে সযত্নে সাজিয়ে রাখলো। চুপি চুপি মিঠুকে বলল, 'বাবার কথা মার সামনে বেশী আলোচনা করবে না, মার মন খারাপ হবে বুঝলে।' মিঠু বুঝলো, সমব্যাথী তন্ময়দাকে ওদের আরও অনেক কাছের মানুষ মনে হলো, যেন কতদিনের চেনা।

—'আচ্ছা মাসীমা, আজ উঠি'

—'আবার আসবে বাবা'

—'নিশ্চয়ই আসবো'

তাঁকে প্রণাম করে বাইরে এসে জুতোর ফিতে বাঁধতে বাঁধতে তন্ময় ভাবলো আজকের দিনটা তার জীবনের সাদা-কালোর ফিল্মের মধ্যের একটিমাত্র রঙিন দৃশ্যের মত বর্ণময়, উজ্জ্বল। মিলু-মিঠুরা ওদের বাড়ীর দরজা পার হয়ে রাস্তা পর্যন্ত ওকে এগিয়ে দিল। মিঠু বলল, 'তন্ময়দা আবার আসবেন কিন্তু'। ছোট্ট মণিময় তার কচিহাতে হ্যাণ্ডসেক্ করলো। বিদায় নিয়ে সে ফিরে চললো পরিতৃপ্তি আমেজে, মনে হচ্ছিল বুঝি একরাশ রজনীগন্ধা বুকে চেপে সে হেঁটে চলেছে। দূর থেকে ঘাড় ফিরিয়ে তন্ময়-দেখলো ওরা তখনও দাঁড়িয়ে আছে, সে হাত নাড়ল। ওরাও হাত নেড়ে তাকে জানিয়ে দিল বিদায়ের শেষ আমেজটুকু তখনও নিঃশেষ হয়নি।

মোড় ঘুরে বাইলেন থেকে লেনএ। সামনে একটা পান-বিড়ির দোকান। তন্ময় দাঁড়াল, ঘড়ি দেখল, অনেকক্ষণ সিগারেট খাওয়া হয়নি—এক প্যাকেট চারমিনার একটা দেশলাই। সে মেজাজ করে ধোঁয়া ছাড়লো, দোকানের আয়নায় নিজের মুখটা একবার দেখলো—লম্বাটে একটা মুখের পোট্রেট, সরু সরু চোখ, মোটা ঠোঁট···কমদামী আয়নার গ্লাসটা খারাপ···সে কিছুটা বিরক্ত হলো। ঠিক এই মুহূর্তে সে নিজেকে অন্ততঃ কিছুটা সুন্দর দেখতে আশা করেছিল। মিনিট চারেক হাঁটলেই বাসরুট পাওয়া যাবে, তন্ময় দেখলো রাস্তার বাঁদিকের সেই রকটায় সেই ছেলেগুলোই গুলতানি করছে যাদের সে মিলুর সঙ্গে আসার সময় দেখেছিল। তাকে আসতে দেখে ওদের মধ্যে একটা নড়েচড়ে বসার প্রস্তুতি দেখা গেল যেন ওরা তারই অপেক্ষায় ছিল। রাস্তায় ঠিক মাঝখান দিয়ে তাদের দিকে একবারও না তাকিয়ে রীতিমত সপ্রতিভভাবে তন্ময় হেঁটে এগিয়ে যাচ্ছিল।

পিছন থেকে একটা কণ্ঠ,

'এই যে, ও পেন্টুল দাদা, শুনুন শুনুন' তন্ময় গতি কমিয়ে দিল, কিন্তু পিছনে তাকাল না।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনাকেই বলা হচ্ছে' সে দাঁড়িয়ে পড়ল, পিছনে ঘাড় ফিরিয়ে 'আমায় কিছু বলছেন ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ চাঁদু, তোমাকেই' একটা অদ্ভুদ হাতের কায়দা দেখিয়ে যে ছেলেটি তাকে কাছে আসতে ইংগিত করলো তাকেই দলনেতা মনে হলো। কিছুদিন আগে এমন ঘটনার সম্মুখীন হলে তন্ময় দুর্বল হোত, ভয় পেত, না ডাকতেই তাদের কাছে গিয়ে হেঁ হেঁ দাদা-দাদা করত, সিগারেট অফার করে নীচতা আর মিথ্যের সঙ্গে আপোষ করে পরিস্থিতি ম্যানেজ করতে সচেষ্ট হত, তেমন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পাছায় দু একটা লাথিও সহ্য করে দাঁত বার করে হাসার চেষ্টা করতো, যেন তেন প্রকারে তার জীবদেহটাকে যতখানি সম্ভব অক্ষত রেখে বাড়ী নামক গর্তে ফেরাব চেষ্টা করতো। কিন্তু এখন সে আহত সৈনিকের মত মরিয়া ভাব নিয়ে সত্যের রূপটা পরখ করতে চাইলো, না, কোনোরকম আপোষ নয়,

'আপনাদের যদি কিছু বলার থাকে ভদ্রভাবে বলুন' সে সোজা হয়ে বুকটান করে বেশ জোরের সঙ্গে কথাটা বললো।

'কেয়াবাত, কেয়াবাত' গোটা দলটা তাকে ঘিরে ধরলো। কাছের ল্যাম্পপোষ্টটার বাল্‌ব নেই, আধো-অন্ধকারে মুখগুলো ভাল করে দেখা যাচ্ছিল না, তবে বেশ বুঝতে পারা যায় যে স্কুল-কলেজের বেড়া ডিঙ্গিয়ে কর্মহীন দলভুক্ত তাদের প্রায় অনেকেই। অখণ্ড অবসর বিনোদনের এই মজাদার পাড়া-পাহারার দায়ীত্বের অধিকার এরা একচেটিয়া করে রেখেছে পশ্চিম বাংলার শহর ও শহরতলীর প্রায় সর্বত্রই। নেতা মুখোমুখী,

'মহাশয়ের নিবাস, কি কর্ম করা হয়, এ পাড়ায় আগমনের উদ্দেশ্য ?'

আর একজনের প্রশ্ন 'কোন পাড়ার মাল দাদা ?' অপমানের, অসম্মানের তীব্র এক সংবেদন তন্ময়ের শরীরের প্রত্যেকটি কোষে, রক্তের প্রত্যেকটি কণিকায় ছড়িয়ে পড়ছিল গোখরোর তীব্র জ্বালাময় বিষের মত।

'আপনাদের কোন প্রশ্নের জবাব আমি দেব না, দিতে বাধ্য নই।'

'ওরে শাল্‌লা, রঙ লিচ্ছে বে, দাঁড়া শালা মজাকি বার করছি—এই ননী, কেস টেকআপ কর বে।'

একটা স্বাস্থ্যবান ছেলে এগিয়ে এল যার হাতের গুলি আর মাংশ পেশী দেখে বোঝা যায় ব্যায়াম করা, 'পাড়ার শক্তিমান রুস্তম।' বাঁহাতে তন্ময়ের ঘাড়টা ধরে হাতে দাঁতে দাঁত চেপে সে বলল।

'শালা, ভাতিবাজি করার জায়গা পাওনি! আমার পাড়ার মেয়ের সঙ্গে লটঘট করতে এসে আমাদেরই রঙ দেখাস বে।'

পেশীবহুল হাতের একখানা মাঝারি ধরনের ঘুসি তন্ময়ের তল পেটে বিদ্যুৎবেগে আঘাত করলো। জ্ঞান হারিয়ে ফেলার ঠিক আগের মুহূর্তে সে তার পুরোনো ধারনায় আর একবার ফিরে এল ঃ

কোথাও আনন্দ নেই, আনন্দ চাওয়ার অধিকার নেই, সুখ—ফুঃ, সব মিথ্যে—শুধুই গোঁজামিল!

———

প্রিয়তমা রেণু

কর্তব্যের দায়ে মানুষকে অনেক সময় অপ্রিয় কর্ম সম্পাদন করিতে হয়। ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগের তদন্তকারী অফিসার হিসাবে সম্প্রতি আমার রিপোর্টের ভিত্তিতে কেষ্টপুর ডাকঘরের পোষ্টম্যান শ্রীযুক্ত প্রভুদয়াল মহাপাত্রের সাময়িক বরখাস্তের আদেশ জারি হইয়াছে। ডাকঘরে জমা হওয়া ব্যক্তিগত চিঠিপত্র পড়া এবং তাহা হইতে পছন্দমত বিশেষ ধরনের বিচিত্র কিছু চিঠি ডেলিভারী না দিয়া নিজের সংগ্রহে রাখার অভিযোগে তাহাকে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। প্রভুদয়ালকে শাস্তি দেওয়ার পূর্বে আসুন, তাহার অমূল্য সংগ্রহের দিকে আমাদের রসদৃষ্টির সার্চলাইট ফেলি :—

প্রাপক : জনৈকা শ্রীমতী রেণুবালা মিত্র,
C/O শ্রীযুক্তবাবু অঘোরচন্দ্র মিত্র,
গ্রাম : কেশবপুর, পোঃ কৃষ্ণপুর,
(ভায়া আরামবাগ) জেলা : হুগলী

প্রেরক : জনৈক শ্রীযুক্ত মন্মথ মিত্র

১ নং চিঠি

ওঁমা

রেণ-বো বোর্ডিং হাউস,
(রুম নং ১৭)
১১৯/১এ, বউবাজার স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

প্রিয়তমা রেণু,

গতকাল তোমার চিঠি পেয়েছি। ভাল আছো জেনে কি ভালই না লাগছে। তোমার আশঙ্কা সত্যি নয়, আউট্ অফ্ সাইট্ হয়ে

দিনরাত ধোঁয়া গিলছি না, তবে উইলস্ ফিলটার—একবার ধরলে এ ছাড়া চলে না। জানোতো—প্রিয় একবার, প্রিয় চিরদিনের—একদিকে তুমি আর অন্যদিকে উইলস্ ফিল্টার, ফিল্টার আর তামাকের মিলনে এর স্বাদ প্রাণে দেয় পরিপূর্ণ তৃপ্তি—প্রতিবার প্রতিক্ষণ। তবে তোমার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করছি, মাত্র এক প্যাকেট্ সারাদিনে।

আমার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা করবে না, ভীষণ ভাল আছি, একেবারে তরতাজা। তবে গত সপ্তাহে একদিন সেভ্ করতে গিয়ে গাল্ কেটে রক্তারক্তি, বোধহয় ব্লেড্‌টা ভাল ছিল না। ভাবছি এবার থেকে 'টোপাজ' ইয়ুজ করবো। আমাদের মেসের পরিমলদা ফিট্‌ফাট্ কেতাদুরস্ত সৌখীনবাবু—অনেক খবর রাখেন। উনি বললেন যে 'টোপাজ' প্রযুক্তিবিদ্যা এবং গুণোৎকর্মের ক্ষেত্রে সবার আগে, ক্রোম স্পাটারিং প্রক্রিয়া টোপাজকে করে তুলেছে অনন্য এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বীকৃত···তাই অনেক অনেক দেশের, অনেক অনেক লোক 'টোপাজ' পছন্দ করেন, প্রতি ব্লেড মাত্র ২৫ পয়সা। ব্লেডের গুণব্যাখ্যানের আদিখ্যেতায় তোমায় নিশ্চয়ই হাসি পাচ্ছে—পাবেই তো, কারণ তোমারও তো মাঝে মাঝে······।

যাক ওসব কথা, এই জানো, তোমাদের সকলের জন্যে আমার ভীষণ মন কেমন করছে—মাত্র ১৫ দিন বাড়ী থেকে এসেছি তবু মনে হয় যেন কতদিন তোমাদের দেখিনি। ভাল কথা, আমাদের 'টুবাই সোনার' বয়সতো তিন মাস হলো। এবার ওকে একটু একটু, 'ফ্যারেক্স' খাওয়াতে শুরু কর। ৩-মাসে বাচ্ছার প্রথম শক্ত-আহারের ওপরেই নির্ভর করতে পারে ওর গোটা জীবন। ডাক্তারবাবু বললেন যে 'শুধুই দুধই যথেষ্ট নয়, দ্রুত বেড়ে ওঠার জন্যে সুষম-শক্ত আহার হলো গ্ল্যাক্সোর ফ্যারেক্স'। ফুলতলি বাজারের মণিময়ের স্টেসনারী দোকান থেকে একটা বড়ো টিন আনিয়ে নিও।

টুকুর বিয়ের বেনারসী কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের 'ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস',

থেকে কিনলে ভাল হয়, ওদের স্টক্ অনেক, পিসীমার সর্দিকাশি সারছে না লিখেছ। বয়স হয়েছে তার ওপর ওঁর শ্লেষ্মার ধাত। আচ্ছা, এবার একটা 'ওয়াটারবেরিজ রেড্লেবেল' নিয়ে যাব। সেদিন বইপাড়ায় গিয়ে লোভ সামলাতে পারলাম না, আকাদেমী পুরস্কারে সদ্যসম্মানিতা মৈত্রেয়ী দেবীর 'ন হন্যতে' এবং বাবলুর ফরমাস্মত সত্যজিৎ রায়ের 'বাদশাহী আংটি' কিনে কিছু বাজে খরচ (তোমার মতে) করে ফেলেছি—রাগ কোরোনা প্লীজ।

তোমার চুল উঠেছে, উঠতে দাও—দুঃখ কি, আমার মাথাও তো প্রায় ফাঁকা। ঐ 'পিওর সিলভিক্রিন' বলো আর 'সলুরিসর্সিনলই' বলো, কিছুতে কাজ হয় না, শুধু টাকার শ্রাদ্ধ, তার চেয়ে 'খাঁটি সিংহ মার্কাই' ভাল। ফর্দ মিলিয়ে বাবার অম্বুরী তামাক, কোলাপুরী চপ্পল, মাছ ধরার বনপাশ বঁড়শী, টুলুর ব্রণর জন্যে 'এস্কামেল,' নীতুর নেলপালিশ 'মাই ফেয়ার লেডী,' তোমার ঐ 'পাঁচ দিনের মেমসাহেবী' 'কেয়ারফ্রী' আর তোমার আমার দুজনের জন্যে,'আরো নিরাপত্তা আরো আরামের জন্যে' 'ডুরেক্স ল্যাবরিকেটেড্ প্রোটেক্টিভ্' সব কেনাকাটা রেডী, এখন শুধু দিনগোনা, কবে এই মোহিনী কলকাতার ঝলমলে রূপের মোহ কাটিয়ে তোমার স্নিগ্ধ সৌন্দর্যের শান্ত সরোবরে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি।

এ মাসের মাইনে পেয়ে ফেব্রুয়ারীর ৫ তারিখ, শনিবার অফিস করে ৬-৩৫-এর লোকালে বাড়ী ফিরবো। হরিকে লণ্ঠন নিয়ে স্টেশনে থাকতে বলবে। ভালো কথা, লণ্ঠনের জোড়াতালি দেওয়া পুরোনো কাঁচটার পথ দেখা যায় না, ওটা পাল্টে একটা নতুন 'দীপ্তি' লাগিয়ে দিও, 'দীপ্তি যেমন মজবুত তেমনই টেক্সই।'

শেষ করছি। বাবা ও পিসীমাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম দিও—ছোটদের স্নেহ আর তোমার জন্যে বুকভরা ভালবাসাসহ অনেক চু··· রইলো।

ইতি—

তোমার মন্মথ

এবার বলুনতো, মাননীয় জুরি মহোদয়গণ, প্রভুদয়াল আইনের চোখে অপরাধী হইলেও এমন একটা রস-সম্পৃক্ত পত্র (কিংবা একটা নিটোল্ সুখীগল্প) নিজের সংগ্রহশালার জন্য নির্বাচিত করিয়া কতখানি রসবোধের পরিচয় দিয়াছে ! দয়া করিয়া বিবেচনা করুন তাহার কসুর মাফ্ করা যায় কিনা !

প্রভুদয়ালের সংগ্রহ হইতে ২নং চিঠি বারান্তরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

সূর্য-বিলাস ও নগ্ন-দধীচি

বন্‌মোরগের ঝুঁটির মত সিঁদুরে আকাশটা দেখে ঝুনুর মনে হলো এমন 'ভাললাগা' বুঝি আর কিছুতেই নেই। ভোরের শিশিরে ভেজা গোলাপী ও'র পায়ের পাতা, ফিকে-হলুদ 'ম্যাক্সীর' প্রান্ত সবুজ ঘাসে হাবুডুবু—যেন এক হলুদ প্রজাপতির ঘাসফুল ছুঁয়ে ছুঁয়ে উড়ে যাওয়া। এই ভোরবেলাতেই টুন্‌টুনিদের নাচানাচি, শালিখ-জোড়ার অকারণ ব্যস্ততা, সজনে ফুলের টুপটাপ ঝরে পড়া—ঝুনুর ছুচোখে মুগ্ধতার কাজল ছোঁওয়া, 'ইস্, কি বিউটিফুল! ফুলদা, তোমাদের কি মজা, এমন সুন্দর সকাল কলকাতায় আমরা কখনও দেখি না।'

সেই কবে ছোটবেলার কথা তেমন মনে পড়ে না, বড় হয়ে ঝুনু এই প্রথম দিঘল্‌হাটির মাটিতে, সেজপিসীর বাড়ী—পার্ট-টুর শেষে একটানা স্বচ্ছন্দ অবকাশ, একরাশ সোনালী-মুক্তি। 'ওমা, ঝুনুসোনা কতবড় হয়েছে, কি সুন্দর মুখখানি—চোখ ফেরানো যায় না'—পিসীমার আদরে যত্নে গলে-যাওয়া একমুঠো বাসন্তী-সুখ। ফুলদার চোখে নবীন মুগ্ধতা, পার্ট-টু দেওয়া ঝুনু এমন মিস্ অনিন্দিতা সেন আর সেজপিসীর সেই দুষ্টু ছেলেটা, ছেলেবেলার সেই 'ফুলদা' এখন দিঘল্‌হাটি হাইস্কুলের 'ইতিহাসের স্যার' শ্রীযুক্ত অনুপম রায়। কিন্তু ফুলদা আর কবিতা লেখে না, শুধু মানুষের কথা ভাবে—দুঃখী মানুষের কথা, এখন ফুলদার দুচোখে অতলান্ত সমুদ্রের বিষণ্ন ছায়া! সেই পুকুর ভরা মাছ, গোয়াল ভরা গরু, 'সুজলাং সুফলাং' শস্যশ্যামলা গ্রাম আর নেই—আখের রস শুকিয়ে একেবারে ছিব্‌ড়ে, শুধু একটু চোখের-দেখা কিছু সবুজ-মুক্তি ছাড়া গাঁয়ে আজ আর কি আছে! চোখ মেললেই দেখা যায় একরাশ আধপেটা মানুষের রোদে-পোড়া কালো শরীর আর বর্ণহীন চোখে সরকারী রিলিফ্-প্রত্যাশা, মরা ডোবার কাদাজলে শামুক-শাপ্‌লার

খোঁজে অর্ধনগ্ন ভারতীয় নারী—দিনযাপনের নিরন্তর 'সতরঞ্চ খেলা'। ফুলদার ভাবনা এদের নিয়েই।

ঝুনু এসব কিছুই জানে না—জানবে কেমন করে, কেনই বা জানবে? ঝুনুদের কলকাতা আর এই দিঘল্‌হাটির রক্তের গ্রূপ কোন দিনও মিলবে না। সে তো হাওয়ার দোলায় দোল-খাওয়া একটা উজ্জ্বল পাতাবাহার, সদ্য বেড়ে ওঠা একটা রঙিন প্রজাপতি। গ্রামের মানুষের দারিদ্র-কঠিন দিন যাপনের পাঁচালী শুনিয়ে এই মুহূর্তে ঝুনুর মুগ্ধ চোখের ভাললাগার স্বপ্নটুকু ভেঙ্গে দিয়ে লাভ কি! তারচেয়ে এখন দিঘলহাটির সবুজ মাঠের পূব-দিগন্তে, বন্‌মোরগের ঝুঁটির মত একটা সিঁদুরে-সূর্য কেমন একটা লাফ্ দিয়ে ভোরের ফিরোজা-আকাশ ছুঁয়ে মুঠোমুঠো আবীর ছড়ায়—ঝুনু শুধু তাই দেখুক আর ওর এই মুহূর্তের ভাললাগার মণিমুক্তো নিয়ে এখনই ঘরে ফিরে যাক, কেননা বেলা বাড়ছে···দিঘল্‌হাটির বুভুক্ষু-দধীচিরা গুহাকন্দর ছেড়ে এবার পথে প্রান্তরে ছড়িয়ে পড়বে।

মুখুজ্যেদার ঘুষতত্ত্ব ও হিতোপদেশ

সকালবেলা মুখুজ্যেদার বৈঠকখানার নড়বড়ে চৌকিতে বসে সেদিনের কাগজখানা ভাগাভাগি করে পড়তে পড়তে চোখে পড়ল বড় বড় শিরোনামা : 'ঘুষ গ্রহণের অভিযোগ অভিযুক্ত অনারেবল ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট।' উত্তেজিত হয়ে কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে উঠলাম 'ঘুষ-ঘুষ-ঘুষ! চারিদিকে কেবল ঘুষেরই রাজত্ব, ছিঃ ছিঃ ছিঃ, দেশটা কোন্‌দিকে চলছে বলুন তো?'

'না হে না' বললেন মুখুজ্যেদা 'ঘুষের কানাঘুষো চলছে অনাদি অনন্ত কাল ধরে, এটা নতুন কিছু নয়, তবে উনি যুগে যুগে রূপ-পরিগ্রহ করে চলেছেন, এই মাত্র।'

'কি রকম' আমি জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকিয়ে থাকি।

'তাহলে বলি শোন' মুখুজ্যেদা আরম্ভ করলেন, 'তোমাদের ঐ দেবাদিদেব মহাদেব তো ছিলেন এক নম্বরের ঘুষবাজ, রাতদিন গাঁজা-আফিং-এর শ্রাদ্ধ করে বোম হয়ে বসে থাকতেন' মুখুজ্যেদা আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিস্‌ফিসিয়ে বললেন 'অবশ্য গোপনে ঐ গাঁজা-আফিং বিদেশে চোরা-চালান করতেন কিনা কে জানে এবং বিদেশী দেবতারা ঐ নেশায় কতখানি আসক্ত ছিলেন তা পণ্ডিতরা হয়ত বলতে পারবেন,' মুখুজ্যেদার কণ্ঠ সোচ্চার হ'ল 'তা জানিস ভাই, বাঁহাতের কারবারে উনি ছিলেন একেবারে সিদ্ধহস্ত। কোথায় কোন্ বেটা এক অসুর কয়েক কলসী পচাই গিলে আসনপিঁড়ি হয়ে অথবা চতুর্দিকে আগুন জ্বেলে, উপর দিকে ঠ্যাং তুলে আর নীচে মাথা রেখে বসল মহাধ্যানে, আর তোদের দেবাদিদেব গেলেন গলে জল হয়ে, শুধু মহাদেব নন, মহা-তেলখোর ছিলেনতো, ঢুলুঢুলু নেত্রে গাঁজার কলকেটি ট্যাঁকে গুঁজে আবির্ভূত হলেন ঐ ধ্যানরত অসুরের সম্মুখে, বললেন :

'এত পাঁয়তাড়া কেন বাওয়া, কি বর চাই বলে ফেল'। তৎক্ষনাৎ ঝাঁকড়া-চুলো অসুর তার বিরাট বপু নিয়ে ভোলানাথের চরণে সাষ্টাঙ্গে লম্ববান, ভক্তি গদগদ কণ্ঠে নিবেদন করলে তার চাই 'অমরতা'। তোদের পশুপতি নেশা করেন বটে কিন্তু খেই হারিয়ে ফেলেন না মোটেই—অনেকদিনের পাকা অভ্যাস তো! বললেন 'না বৎস, তাতো হয় না, অন্য বর চাও।' তাঁর আপত্তির কারণটা ব্যাখ্যা করলে, এই রকম দাঁড়ায়—'ঘুষ নিতে পারি তাবলে কোম্পানীর কারবারকে একেবারে ডকে তুলে দিতে পারি না।' অসুর ছোঁড়াটা সবই বুঝলো, তাই সে কায়দা করে 'দেব-দানব-গন্ধর্ব-মানব' এর সহিত যুদ্ধে অজেয়তা প্রার্থনা করলো—'ওয়ারল্ড হেভী ওয়েট্ বক্সিং চ্যামপিয়ান-শিপ' আর কি। ছোট কস্‌কেতে একটা সুখটান দিয়ে বোম্ হয়ে আশুতোষ বললেন 'তথাস্তু—পলিটিকস্‌টা বুঝলি তো?' চস্‌মার ফাঁক দিয়ে চোখ পিট্‌পিট্ করে মুখুজ্যেদা আমার দিকে একটু দৃষ্টির সার্চলাইট ফেললেন, আমি বললাম 'কেন বুঝবো না দাদা, এযে তত্ত্বসার! আপনি গুণীজ্ঞানী বিজ্ঞজন—আমরা অর্বাচীন অভাজন, মানে 'কাল্ কা যোগী তো।'

'থাক থাক, আর কথার খই ফোটাতে হবে না, চোখকান বুজে শুনে যা।'

'চোখ বুজে শোনা যায় কিন্তু কান বন্ধ করলে শুনবো কেমন করে দাদা' আমি মৃদু প্রতিবাদ করি, কিন্তু ছোটকথা মুখুজ্যেদা কানেই তোলেন না, তাই আবার তাঁর তত্ত্বকথা শুরু করলেন, 'এবার একেবারে মহাকাব্যের যুগে চলে এস ভায়া, একেবারে রামায়ণের কিষ্কিন্দা কাণ্ডে। সামনে সমুদ্রের বিরাট জলরাশি দেখে অযোধ্যার প্রিন্স শ্রীরামচন্দ্র ভাই লছমনের হাত ধরে ভেবেই আকুল, 'ভাইরে, পার হই কেমন করে বল দোখ, (আরতি সাহা, বিমল চন্দ্র বা মিহির সেন নই যে সুইমিং কস্টুম্‌টা গায়ে জড়িয়ে দুর্গা বলে ড্রাইভ মারি···মুখুজ্যেদার সংযোজন) ছোটবেলা থেকে রাজবাড়ীর চৌবাচ্ছায় স্নান করে

আসছি—সাঁতারটা শেখার সুযোগই পেলাম না, এখন বুঝছি হাড়ে হাড়ে।' এমন সময় চিন্তাকুল ভ্রাতৃদ্বয়ের সম্মুখে আবির্ভূত হলেন রক্ষপতির সুযোগ্য ভ্রাতা বিভীষণ, সেকালের ঝানু ডিপ্লোম্যাট। রাজনীতির জগতে জার্মানীর বিশমার্ক যদি বিশ মার্ক তবে উনি ছিলেন একেবারে বিশ দুগুণে চল্লিশমার্ক মানে মার্কামারা আর কি। অধিবেশন শেষে রাম-বিভীষণ সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন, স্থির হলো রক্ষভ্রাতা লঙ্কা আক্রমণের আলিগলির খবর আর লঙ্কার মহাবীরদের মৃত্যুবান এবং গোপন অন্ধিসন্ধি—সবকিছু জানাবে—রীতিমত স্পাইং, আর এর প্রতিদানে তার চাই লঙ্কার স্বর্ণসিংহাসন, এমন মিত্র কি হাতছাড়া করা যায়, রঘুপতি তৎক্ষণাৎ রাজি। লঙ্কার রাজভ্রাতাকে মহাকাব্যের কবির ভাষায় 'ঘরশক্রু' বললে অবিচার করা হয়, কেননা আজকের পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ভিত্তি এই মূলমন্ত্রের উপরেই দাঁড়িয়ে আছে।'

কথা থামিয়ে হঠাৎ মুখুয্যেদা একটা দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে চৌকির তলায় ঢুকলেন আর যেখানে বসেছিলেন আর ঠিক নীচেই আগুনের শিখাটা ধরলেন। আমি ঘাবড়ে গিয়ে বলে উঠলাম 'করেন কি মুখুয্যেদা, নড়বড়ে বলে কি চৌকিটাকে পুড়িয়ে ফেলতে হবে, গল্পটা শেষ করে সময়মত ধীরেসুস্থে এটাকে চেলিয়ে দিলে বৌদির রান্না-বান্নার সুবিধে হত, কয়লাও বাঁচত।'

'না রে হাঁদা গঙ্গারাম না, চৌকি পোড়াচ্ছি না, ছারপোকা মারছি' নীচ থেকে মুখুজ্যেদা বললেন 'ব্যাটারা বিভীষণের জাত-ভাই তো, তাই বিভীষণের নিন্দে সহ্য করতে না পেরে একযোগে প্রোটেস্ট করছিল, ওঃ একেবারে ফুলিয়ে দিয়েছে র‍্যা।' ছারপোকা নিধনপর্ব শেষ হলো, চৌকির তলা থেকে বেরিয়ে এসে চেপেচুপে বসে দাদা বললেন 'এবার তোকে এক প্রেমিক ঘুষখোরের কথা বলব, কাহিনীর রস পেতে হলে তোকে মহাভারত পড়তে হবে, সময়মত পড়ে নিস। ঘটনাটা সংক্ষেপে মোটামুটি এই রকম : পাণ্ডবদের রাজত্ব কালে মাহিষ্মতী বলে একটা

রাজ্য ছিল আর সেই রাজ্যের সুন্দরী বাজকুমারীর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন অগ্নিদেব অনল। এই অনলদেবের ভাবী শ্বশুরমশাই অর্থাৎ ঐ মাহিষ্মতী রাজ্যের রাজা নীল ছিলেন ভীষণ গোঁয়ারগোবিন্দ এবং আত্মমর্যাদাসম্পন্ন রাজা। অশ্বমেধ যজ্ঞ শেষে পাণ্ডবরা তাঁদের সার্বভৌমত্ব প্রমাণেব জন্য ঘোড়া ছেড়ে দিলেন আর রাজা নীল পাকড়াও কবলেন সেই ঘোড়া—অর্থাৎ পাণ্ডবদের আনুগত্য অস্বীকার —যুদ্ধ শুরু হলো। এদিকে মাহিষ্মতীর রাজকুমারীর পুজোপচারে তুষ্ট, প্রণয়ে মুগ্ধ বহ্নিদেব, যজ্ঞপ্রিয় ধার্মিক পাণ্ডবদের যজ্ঞারাধনা উপেক্ষা করে ঐ যুদ্ধে মাহিষ্মতীর পক্ষ নিলেন, রক্ষা করলেন মাহিষ্মতীর প্রসাদ-কেতন, মাহিষ্মতীর অবসানে প্রণয়িনী-পূজারিণী-রাজকুমারীর দীপ নেভার ভয়ে ভীত অনলদেব ধর্মকে বিসর্জন দিলেন অকাতরে, রাজ-কুমারীর প্রেমঘুষে কাজটা কেমন হলো, দেখলিতো।'

আমি বললাম 'বাঃ দাদা, আপনি যে মাঝেমাঝে আপনার ঘুষ-তত্ত্বকে কাব্যিক ভাষার নুনঝাল মাখিয়ে কচি শশার মত পরিবেশন করছেন, ব্যাপাব কি?' দাদা বললেন 'কি আর করি বল ভায়া, বুড়ো মানুষেরও একটু কাব্যচর্চার শখ হয় তো, যেমন কুঁজোরও মাঝেমাঝে চিৎ হয়ে শুতে ইচ্ছে করে। কাব্যটাব্য যখন বললি তখন তোদের দেশের এক কবির কথাই বলি। এককালে দেশ তো 'ভারতচন্দ্র ভারতচন্দ্র' কবে পাগল হয়েই উঠেছিল। আরে বাবা, একটু তলিয়ে দেখ, তরে তো বাহবা দিবি। তা নয়, শুধু খোল-করতালের আওয়াজেই অতিভক্তের চোখে শ্রীহরির আবির্ভাব, গণ্ডে সহস্র ধারার প্রবাহ। ঠ্যাঙেব ওপর ঠ্যাঙ দিয়ে আরামে থাকা—সন্তানকে 'দুধে ভাতে' রাখা আর গড়গড়ার আগুন যাতে না নেভে এই সুব্যবস্থার প্রয়াসী আমাদের 'রায়গুণাকর' মশাই তদানিন্তন দেশ-প্রেমিকদের—চাঁদ-কেদার-প্রতাপকে ছেড়ে কোন এক অখ্যাত গেঁয়োযোগী ভবানন্দ মজুমদারকে ভজনা করলেন। কবিবরের দূরদৃষ্টি ছিল বৈকি—নজরানা স্বরূপ 'অন্নদামঙ্গল' না লিখলে তো আর উপাধি মিলতো না। এবার

মুখুজ্যেদা বললেন ‘দেখ ভায়া, একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলছি, সাহিত্য-গবেষকদের চোখে আমার এই তত্ত্বের ভুল-ভ্রান্তিও বেরিয়ে পড়তে পারে, তাঁদের একটু ক্ষেমাঘেন্না করে নিতে অনুরোধ করিস।’

আমি বললাম, ‘কি যে বলেন দাদা! আপনার কথা যে অমৃত-সমান, ওতে কি রাগ করা চলে, আপনি আমাদের এতই নির্বোধ ভাবেন?’

দাদার মুখে পরিতৃপ্তির হাসি, বললেন ‘দেখ মণ্টে, এই যে তোর ছেদ্দাভক্তি, এত বিনয়—এর মূলে কি জানিস? ঐ যে সংস্কৃতে একটা শ্লোক্ আছে ‘বিদ্যা দদাতি বিনয়ং’—পেটে ডুকলম্ আছে তাই তো!’ বললাম, ‘কি যে বলেন দাদা! তা ওসব কথা থাক্, আপনার ঘুষতত্ত্ব আবার শুরু করুন, চোখ কান বুজে শুনি।’

অফিস থেকে হাতিয়ে আনা টাইপ্‌রাইটারের রিবন্ রাখার কৌটো থেকে একটা বিড়ি নিয়ে দাদা তাঁর কানের কাছে ডুবার পাক খাইয়ে কি যেন শোনার চেষ্টা করলেন, মুখের দিকটা বারত্বয়েক ফুঁ দিয়ে অদ্ভুত কায়দায় বিড়িটা ধরিয়ে নিয়ে বারকয়েক বেশ জোরে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে মুখুজ্যেদা তাঁর তত্ত্বের পরবর্তী অধ্যায় শুরু করলেন ‘আমার দাদু—মানে মায়ের বাবা ছিলেন ইংরেজ আমলের এক থানার বড়কত্তা। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর ভাষায় তিনি ছিলেন একদিকে যেমন বজ্রের মত কঠোর তেমনি অপর দিকে ছিলেন ফুলের মত কোমল। থানার কত্তাদের এই অপর দিকটার কথা নিশ্চয়ই বুঝিয়ে বলতে হবে না! ছোটবেলায় একবার মামারবাড়ী বেড়াতে গিয়েছি। একদিন সকালে পাড়ার একটি ডেঁপো ছোকরা আমায় শিখিয়ে নিলে দাদুকে জিজ্ঞাসা করতে যে ঘুষ কাকে বলে। অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে ছুটলাম বাড়ীর দিকে, মামাবাড়ীর অন্দরে প্রবেশ করতেই দিদিমা এক মস্ত হাঁড়ি থেকে বিরাট সাইজের কয়েকটি রসগোল্লা আমাকে অনায়াসে উপহার দিলেন। দাদু ইজিচেয়ারে

শুয়ে গড়গড়া টানছিলেন, কথাটা মনে পড়ে গেল, জিজ্ঞাসা করলাম 'দাদু, ঘুষ কাকে বলে?'

'ঐ যে তুমি খাচ্ছ' বলেই পুলিসী-কণ্ঠে দাদুর সে কি হাসি!

দিদিমা মুখঝাম্‌টা দিয়ে বলেন 'কথার ছিরি দেখ না, ঐটুকুর দুধের বাচ্ছার সঙ্গে ন্যাকামো করতে লজ্জা হয় না তোমার।'

দাদুর হাসি তবু থামতে চায় না, দিদিমা আরো রেগে গিয়ে দুপ্‌দাপ্‌ করে পা ফেলতে ফেলতে রান্নাঘরের দিকে চলে যান, আমি তো হতভম্ব। দেখ ভায়া, সেই তখন থেকেই ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করে আসছি। এখন মনে হয়, ঘুষ বুঝি ঐ রসগোল্লার চেয়েও মিষ্টি!

সেবার কি হয়েছিল জানিস্। এন্ট্রান্স পরীক্ষার ফলাফল বেরোবার পরদিন পাড়ার জাগ্রত ৺মা কালীতলায় ঢাকের আওয়াজ পেলাম। আমাদের সিনিয়র বন্ধু গদাই-এর সপ্তম প্রচেষ্টা সাকসেস্‌ফুল, তাই গদাই-এর মা, ৺মা কালীর কাছে জোড়া-পাঁঠার পূজো দিচ্ছেন। চাট্‌জ্যে বাড়ীর ছাদে আমরা মানে গদাই চাট্‌জ্যের বন্ধুরা, তার এই এন্ট্রান্স পাশ তথা ধৈর্য্যের পরীক্ষার সফলতাকে সেলিব্রেট্‌ করছি। কাঁচি সিগারেটে একটা জোরে টান মেরে, দীর্ঘ দাড়িগোঁফে হাত বুলিয়ে গদাই বললে, 'এবার এগুলোর গতি করবো। তা ভাই, যাই বলিস, মা কালী বলে একটা জিনিস আছে মাইরী, গত ছবার তো ছটা জাগ্রত দেবদেবী দেউলে হয়ে গেলেন, এখন দেখছি শুধু মা কালীরই কিছু পাওয়ার টাওয়ার আছে, আগে জানলে দুটো পাঁঠার বদলে দুটো মোষ মানত করতুম মাইরী, তাহলে ফার্স্ট ডিভিসন্‌টা আটকাত কোন শ্লা'। বলা বাহুল্য, তৎক্ষণাৎ আমরা গদাইকে একবাক্যে সমর্থন জানিয়েছিলাম কারণ দুপুরের প্রীতিভোজটা তখনও বাকি ছিল।'

মুখুজ্যেদা বালিসটাকে কোলে নিয়ে আরাম করে বসে বলতে লাগলেন, 'গ্রামের ছেলে অমর, রেলকোম্পানীর টিকেট্‌ কালেক্‌টারের

চাকরী করে, রোদে দাঁড়িয়ে, দৌড় ঝাপ্ করে, চাকরীর মাস মাহিনায় তার পোষায় না। তাই গঙ্গাস্নানের যাত্রী থেকে শুরু করে পুঁই শাকের ব্যাপারী পর্যন্ত সব মনস্তত্ত্ব তার নখদর্পণে, তাই স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে সিকিটা-আধুলিটা পকেটে পুরতে তাকে বিশেষ বুদ্ধি খরচ করতে হয় না। এক গাঁয়েই আমাদের বাড়ী ছিল তো, সেইজন্যে ছেলেবেলা থেকেই তার সঙ্গে আমার মেলামেশা ছিল—গল্পটা সেই আমায় বলেছিল: একটা ট্রেন ছেড়ে গেছে, ওভারব্রীজের গেটে দাঁড়িয়ে অমর ডিউটি দিচ্ছে। প্রায় সব যাত্রীই গেট পার হয়ে চলে গেছে। এমন সময় এক কুঁজো বুড়ি পুঁটুলি বগলে লাঠি ঠক্‌ঠক্ করতে করতে এগিয়ে এল, অমর টিকিটের জন্য হাত বাড়াল। বুড়ি ফোক্‌লা মুখে একটু মিষ্টি হেসে বললে 'আমার তো টিকিট লাগে না বাছা—আমি যে অমরের পিসী—আমার অমরাকে তো সবাই চেনে বাবা—এই ইষ্টিসানের টিকিটবাবু, তা বাবা, দেখা হলে অমরাকে বলিস্‌তো যে তার পিসী গঙ্গাস্নানে গ্যাছে।' হতবাক্ অমর বললে, 'ও বুড়ি, কি যা তা বলছো? আমিই তো অমর—আর আমারতো কোন পিসী টিসি নেই।'

বুড়ি একটুও নার্ভাস না হয়ে, আরো একটু মিষ্টি হেসে অমরের চিবুক ধরে একটু আদর করে চুমু খেয়ে আঁচলের খুঁট থেকে একটা আধুলী বার করে বললে, 'তুই বাবা যখন অমরাই হলি তাহলে এইটে রাখ আর আমায় ছেড়ে দে, দেরী হলে আবার দশটার টেরেনে ফিরতে পারবো না।' তারপর বুড়ি কখন লাঠি ঠক্ ঠক্ করতে করতে ব্রীজ পেরিয়ে চলে গ্যাছে অমর তা টেরই পায়নি, কারণ তার ঐ অচেনা বুড়ি পিসীর ক্ষণ-সাহচর্যের কৌতুক ও বিস্ময়ের যুগপৎ আক্রমণে সে কিছুক্ষণ আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়েছিল, সম্বিৎ ফিরলে হাতের আধুলীটা নাড়াচাড়া করে আরও চমৎকৃত হয়ে আবিষ্কৃত করলো যে সেটাও অচল।

মুখুজ্যেদার রসাল ঘুষতত্ত্ব শুনে হাসতে হাসতে আমার পেটে

ব্যথা, চোখে জল, এমন সময় বৌদি অর্থাৎ মুখুজ্যেদার সহধর্মিনী দু-কাপ চা আমাদের সামনে উপস্থাপিত করলেন। চা এর চুমুকে পুনরায় ঘুষতত্ত্বের আলোচনাটা বেশ জমে উঠছিল, এমন সময় বাজারের থলে হাতে বৌদির পুনরাগমন হলো, বললেন, 'ঠাকুর পো, বাজারটা করে এনে দেবে ভাই? তোমার দাদা কেবল বড় বড় তত্ত্বই শুধু আওড়াতে পারেন, কিন্তু দেখে শুনে কেনা-কাটা করতে বললে বেশী বেশী দাম দিয়ে এমন সব জিনিস নিয়ে আসেন যা দেখলে গা-পিত্তি জ্বালা করে—এমন 'ভিটামিন্ ভিটামিন্-বাই' তা তোমায় আর কি বলব!' বৌদিকে সম্মতি জানিয়ে, তাঁর দিকে হাত প্রসারিত করে, যাত্রার এ্যাক্টোর ভঙ্গিতে :

'নহে অনুরোধ, কহ আজ্ঞা দেবী!
এবে দাস, চলিল বাজারে,
আজ্ঞা তব যথাযথ পালিবে নিশ্চয়॥'

বৌদি হাসি হাসি মুখে বললেন, 'যেমন দাদা, তেমনি ভাই—রতনে রতন চিনেছে। তা হ্যাঁগো ঠাকুরপো, তোমার সেই ব্যাপারটার চিন্তাভাবনা করেছো? মতিস্থির করে, কবে আমায় ফাইন্যাল্ কথা জানাবে বলো?'

এবার আমি আসন্ন ঝড়ের বিপদ-সংকেত পেলাম। বৌদির 'সেই ব্যাপারটা' হ'লো আমায় গাড্ডায় ফেলার ব্যাপার অর্থাৎ আমাকে পাত্রীস্থ করার একটা ভয়ংকর ইচ্ছে, ওনারই এক পিসতুতো বোনের কন্যায় আজীবন মিসা-বন্দী করার ধান্দা, যিনি চেতলাবাসিনী এক আলোকসামান্যা অদ্বিতীয়া, যাঁকে এখনও চোখে দেখিনি অথচ তাঁর বডিওয়েট্ কত কিলোগ্রাম, উচ্চতা কত মিটার ও সেন্টিমিটার, রমেশ পালের প্রতিমার সঙ্গে তাঁ'র মুখের ছাঁদে কতখানি মিল, অমাবস্যার অন্ধকারেও তাঁকে কেমন ধপ্ধপে্ দেখায়, তাঁর কুঞ্চিত-কৃষ্ণ-কেশদামের এ্যাভারেজ্ গ্রোথ্ রেট কত ইত্যাদি ক্রমাগত এনাউন্স করে বৌদি

তাঁর পিসতুতো বোনের নিখুঁত এবং সম্পূর্ণ একটা ছবির পোষ্টার আমার মনের দেওয়ালে মজবুত করে সেঁটে দিয়েছেন।

স্নুতরাং রণে ভঙ্গ দিতে হলো। ঘুষতত্ত্বের দ্বিপাক্ষীক অধিবেশন এইখানে শেষ করে, থলে হাতে বাজার অভিমুখে চলতে চলতে হঠাৎ মনে হলো বৌদির দেওয়া লোভনীয় এবং ধূমায়িত চা এর কাপটাও তো 'ঘুষের ঘুঘুপাখী' ছাড়া আর কিছুই নয়! চারপাশ তাকিয়ে, রাস্তার লোকজনদের দিকে একবার নজর বুলিয়ে নিয়ে, টপ্ করে নিজের কানটা নিজেই মুলে দিয়ে নিজেকেই ধম্‌কে উঠলাম, 'হতচ্ছাড়া, ঘুষতত্ত্ব বুঝতে তোমার এত সময় লাগে কেন!'

চাটুজ্যেদার শালিতত্ত্ব ও হিতোপদেশ

(শ্রীযুক্ত শালিবাহন্ চট্টোপাধ্যায়ের ডায়েরী হইতে সংগৃহীত)

আমার শ্যালিকাটি বেশ। বাকপটু, বুদ্ধিমতী, সুরসিকা, তন্বী-সুন্দরী, বর্তমানে কলেজে পাঠরতা। না না, ঘাবড়াইবার কোন হেতু নাই। হে অবিবাহিত যুবককুল! অতঃপর এতস্বিধ ব্যাপারে কিঞ্চিৎ-মাত্র নার্ভাস না হইয়া ধৈর্য সহকারে সমুদয় বৃত্তান্ত অনুধাবন করিলে একপ্রকার বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবেন। প্রথমেই মনে রাখিবেন আমার শ্যালিকার রূপ গুণ বর্ণনা করিয়া রবিবাসরীয় কাগজে পাত্র-পাত্রী বিভাগে ফলাও বিজ্ঞাপন দিতেছি না কিংবা কফিহাউসে আড্ডা-রত আমার কোন অনুগত ভ্রাতৃস্থানীয়ের (বেকার নয়) হাতে শালিকাটিকে গচাইবার তালেও নাই। নিজের ব্যাপারে যাহোক কিছু একটা কাণ্ডকারখানা ঘটিয়ে আমার শ্যালিকাটিকে অদূর ভবিষ্যতে একটা শক্তিশালী 'ফ্যামিলি ম্যাগ্‌নেট্' হয়ে বসিবেই সে সম্বন্ধে আমার বিশ্বাস পুরোপুরি। কয়েকটা কথোপকথনের নমুনা দিলেই বুঝতে পারিবেন কি ভীষণ জিনিস নিয়ে আমায় ডীল করিতে হয়। আমার চতুর্থ কন্যা ফুট্‌ফীর জন্মের পর শ্বশুরবাড়ী গিয়াছিলাম দুটি উদ্দেশ্য লইয়া—প্রথমতঃ, আমার ধর্মপত্নীর মেদবহুল বিপুলাঙ্গের কোন পরি-বর্তন হইয়াছে কিনা এবং দ্বিতীয়তঃ, আমার নবাগতা কন্যাটিও তার পিতার কুচ্‌কুচে কৃষ্ণবর্ণ রূপ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে কিনা—তাহা অবলোকন করিতে।

অভ্যর্থনার প্রাথমিক পর্ব শেষ হলে শালির মুখোমুখি হলাম। হাসিহাসি মুখে তাঁর প্রথম শরক্ষেপ :

"হে নগরপালের বিশিষ্ট অনুচর (ক্যালকাটা পুলিসে সার্জেণ্টের চাকরী করি) নগর রক্ষার জন্য মনোযোগ ব্যাহত করিয়া নাগরিক বৃদ্ধির জন্য এত যত্নবান হইতে কে আপনাকে মাথার দিব্যি দিয়াছে?"

ইতিমধ্যে আমিও মনে মনে প্রস্তুত হইবার প্রস্তুতি চালাইয়াছি। সুতরাং অতিবিনীত হেঁ হেঁ ভাবে বলিলাম: "কেন শুধু শুধু লজ্জা দাও টুস্‌কীদেবী (আমার শ্যালিকার ডাকনাম) ওসব ব্যাপারে আমার কি কোন হাত আছে? সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা।" আমি যুক্তকর কপালে ঠেকাই। তারপরই বিস্ফোরণ,

'আচ্ছা জামাইবাবু, আপনি কি রকম মানুষ বলুনতো? বছর বছর ধকল সহ্য করে দিদির চেহারাটা কি হয়েছে দেখেছেন?'

মনে হলো, বলি যে ধকল সহ্য করে তোমার দিদির চেহারাটা এখন যেরকম দাঁড়িয়েছে বছরের সব সময় মোটামুটি সে রকম থাকলেই ভাল, নচেৎ রক্তচাপহেতু পটলতোলাও অসম্ভব নয়। কিন্তু মুখে বলতে ভরসা হলো না। আমার শ্যালিকাটির দিদিপ্রীতি এতই প্রবল যে আমার উপরোক্ত বক্তব্যটুকু প্রকাশ হলে যথেষ্ট বিপদের সম্ভাবনা। সুতরাং চুপ্‌চাপ কাঁচুমাঁচু ভাব করাই বুদ্ধিমানের কাজ। সুতরাং কাজও হলো। আমাকে চুপচাপ থাকতে দেখেই হয়তো তরুনী হৃদয়ের কোমলতা থক্‌থকিয়ে উঠলো—সুদর্শনা-রসিকা রসিকতায় মুখর হলো।

"জামাইবাবু, ও জামাইবাবু! রাগ করলেন নাকি?" আমি হাসি হাসি (বোকা বোকা) মুখে ঘাড় নাড়ি।

আচ্ছা জামাইবাবু, আপনারতো গোলগাল 'আলুমার্কা' চেহারা এর ওপর খোঁচাখোঁচা গোঁফ রেখেছেন কেন? আপনাকে বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে।

আমি বিনীত হেঁ হেঁ, আবার বলি,

"কি আর করি বল। পুলিস সার্জেন্টের চাকরী করি। একটু মোঁচ্‌টোঁচ্‌ না রাখলে গুণ্ডাবদমাস্‌গুলো মানবে কেন!"

"না না, গোঁফ কেটে ফেলবেন। আপনাকে বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে।"

আমি বলি: "তাই হবে টুস্‌কী দেবী! রিটায়্যার করার পরদিন

আমার এই গোঁফের চিহ্নও দেখতে পাবে না, আমি তোমায় কথা দিলাম।"

টুস্‌কী দেবীর পরবর্তী আক্রমণ,

"সত্যি জামাইবাবু, আপনি এমন মজার মজার কথা বলেন, আপনাকে আমার কি ভালো যে লাগে! জানেন জামাইবাবু, আমার ইচ্ছে হয় আপনাকে ঘণ্ট করে খাই।"

"ইস্‌-স্‌, চুপ-প" আমি তর্জনী দিয়ে ইংগিতে তাকে থামিয়ে দিই। সে বিস্মিত নেত্রে আমার দিকে চায়। আমি আরম্ভ করি,

"জানোতো টুস্থুরাণী, তোমার দিদি ডাল দিয়ে মাছের মুড়োর ঘণ্ট খেতে কি ভালই না বাসে! এদিকে তুমি যখনই তোমার ঐ ঘণ্ট খাওয়ার সাধ মেটাবে তখন থেকেই তোমার দিদিকে নিরামিষাশী হতে হবে। তাই কি তুমি চাও?"

"সত্যি বলছি জামাইবাবু, আমি অতশত বুঝে কথাটা বলিনি। আপনি যেন দিদিকে কথাটা বলবেন না—কেমন?" আমি বলি,

"বালাই ষাট্‌, তাই কখনও বলি! তোমার প্রতি আমার একটা ইয়ে নেই!"

ওষুধও বিলিতি কোম্পানীর এবং ডোজও পরিমাণমত, সুতরাং তড়িঘড়ি কাজও হ'লো। শ্যালিকাটি মোটামুটি শালীনতা বজায় রেখে ঘন হয়ে বসে আদুরে আদুরে গলায় বলল,

"জামাইবাবু, আপনি চুরুট্‌ খাবেন? বাবার ড্রয়ারে ভাল বর্মা চুরুট আছে। একটা চুরি করে আনব?"

এরকম ছোটখাট লোভনীয় চুরির ব্যাপারে প্রশয় দেবার লোভ সামলাতে পারা নিতান্ত কঠিন। যথারীতি শ্বশুরের নিত্যব্যবহার্য দামী চুরুট এল। আরাম-কেদারায় শায়িত আমার ঠোঁটে শ্যালিকাই উপস্থাপিত করল সেই ধূম্রদণ্ড, রিনিরিনি-ঠিনিঠিনি ধ্বনির সঙ্গে চম্পা-কলি আঙ্গুলের দ্বারা প্রজ্জ্বলিত হলো দেশলাইএর কাঠি, অতঃপর সেই অগ্নি সংযোজিত হলো আতরগন্ধী চুরুটের অগ্রভাগে। সন্ধ্যার আলো-

কোজ্জ্বল ড্রয়িংরুমে চুরুটপানরত শায়িত আমি, আরাম-কেদারার হাতলে উপবিষ্ট তন্বী-টুস্‌কীসুন্দরী, অন্দরে জামাতা আপ্যায়নের উপযুক্ত, উপাদেয় আহার্য-উপকরনাদি প্রস্তুতের শব্দ ও আঘ্রাণের অবস্থিতি—সব মিলিয়ে একটা কাব্যের জগৎ !

যাই হোক, চুরুটের চুমুকে আলোচনার আমেজ এলো। টুস্‌কী সাহিত্যালোচনা আরম্ভ করলো,

"আচ্ছা জামাইবাবু, আপনি সমরেশ বোসের বিবর পড়েছেন ?" গল্পের বইটই পড়া বা সাহিত্য-টাহিত্য আমার তেমন পোষায় না। সারাদিন রাস্তায় রাস্তায় মোটরবাইক্ নিয়ে টো টো করে ডিউটি দিয়ে, রাজ্যের খিস্তিখেউড় করে এবং পাঁচটা পাঁচরকম দেখেশুনে তারপর আর সাহিত্য-টাহিত্য ইত্যাদি সুকুমার বৃত্তির পরিচর্যা করার ইচ্ছে বা প্রবৃত্তি হয় না। নেহাৎ বিবরটা 'এ' মার্কা বই বলে একদিন টপ্ করে পড়ে ফেলেছিলাম। তখন বুঝিনি এমনভাবে কাজে লেগে যাবে। সুতরাং শ্যালিকার প্রশ্নের জবাবে বেশ গর্বভরে ঘাড় নেড়ে জানালাম বইটা আমার পড়া আছে।

"বেশ শক্ত কব্জিতে লেখা উপন্যাসটা, তাই না জামাইবাবু ?" টুস্‌কীর প্রশ্ন,

"আচ্ছা বলুনতো 'বিবর'-এর মধ্যে আপনার কোন্ চরিত্রটা সবচেয়ে ভাল লাগে মানে আপনার মনে রেখাপাত করেছে ?"

টুস্‌কী আশা করেছিল নায়ক-সর্বস্ব উপন্যাস 'বিবর' এর নায়ককে নিয়েই আমি আলোচনা করব। কিন্তু আমি তার ধারেকাছেও গেলাম না। খানিক চিন্তার ভান করার পর তাকে হতবাক করে দিয়ে ধীরে ধীরে বললাম,

"আচ্ছা টুসকী, বিবরের মধ্যে সেই তুম্বো-মুখো, খোকা খোকা-ভাব্ গোয়েন্দা পুলিস অফিসারটার কথা তোমার মনে পড়ে ? তা দেখ, বইটা পড়েছি বটে কিন্তু সেই পুলিস অফিসারটা ছাড়া আর আমার কিছুই মনে নেই।"

তারপর হাসির বিস্ফোরণ—আমার শ্যালিকার কি অশালীন হাসির ধমক। হাসতে হাসতে চোখে জল, চুলের রাশি আর শাড়ীর আঁচল একাকার। আমি নিরাপদ দূরত্বে, তারপর,

"উঃ জামাইবাবু, আপনি একটা বিচ্চু, একটা ভয়ানক ভয়ংকর লোক। আপনার সব মনে আছে। তা নাহলে 'তুম্‌বো মুখ খোকা খোকা ভাব' পুলিস অফিসারটার নিখুঁত ছবি আপনার মনে থাকবে কি করে! আমার ক্লাসের বান্ধবীদের কাছে যদি আপনি এটা ছাড়তেন তাহ'লে তারা নিশ্চয়ই হাসতে হাসতে হার্টফেল করতো! উঃ, আপনি কি সাংঘাতিক্ রসিক।" টুসকীর হাসি আর থামতে চায় না। কিন্তু আমি এত হাসির মধ্যেও রীতিমত সজাগ। জানি, এই হাসির কিয়দাংশও ইথারে ভেসে চলেছে অন্তঃপুর অভিমুখে এবং অচিরেই এমন একজনের হঠাৎ আবির্ভাব ঘটবে যিনি হাসি হাসি মুখে এই জমকালো আলোচনা-কক্ষে ঢুকতে ঢুকতে বলবেন,

"এত হাসির কি হলো (এত র‍্যালা কিসের)?" অথচ তৃতীয় ব্যক্তির (শালির) দৃষ্টি এড়িয়ে তাঁর নেত্রযুগল আমার দিকে অগ্নিবর্ষণ করবে এবং সার্চলাইট ঘুরিয়ে যাচাই করে নেবে যে আমার বর্তমান পরিস্থিতিটা ভদ্র না বেহায়া পর্যায়ের। তিনি আর কেউ নন, আমার বিপুলাঙ্গী হৃদয়েশ্বরী নোন্‌তা (আমার স্ত্রীর ডাক্‌নাম)। সুতরাং টুস্‌কী যতই হাসতে হাসতে শালি হিসাবে শালীনতা হারাতে চেষ্টা করে আমি ততই নিরাপদ দূরত্বে থেকে নোন্‌তার আগমন প্রতীক্ষা করি। তারপর যথারীতি পর্দা নড়ে ওঠে, আমি আরও সজাগ হই। দিদিকে দেখে টুসকী আরও হেসে উঠে বলে,

"জানিস দিদি, জামাইবাবুটা কি হাসতে পারে। উঃ, হেসে হেসে আমার পেটে ব্যাথা হয়ে গেল।"

তারপর কি কি ঘটলো তার আভাষ তো আগেই দিয়ে দিয়েছি। আপনিও যে কোন সময়ে এই রকম শালিবিভ্রাটে পড়ে নাজেহাল হতে পারেন। তাই আপনারই সুবিধার্থে একটি গোপনতত্ত্ব জানিয়ে

আপনাকে সাবধান করে দিতে চাই। এই রকম ভিজে ভিজে হেভী মাঠে খেলতে নেমে সব সময়েই নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখার চেষ্টা করবেন এবং ঘন ঘন অফ্‌সাইড্‌ করে রেফারীকে হুইসেল বাজাবার সুযোগ দেবেন। দেখবেন প্রতিপক্ষ বেশ খুশী খুশী আর আপনিও গোলমেলে অবস্থাটা বেশ আয়ত্বে এনে ফেলেছেন।

মেয়েমানুষ

চোখে চোখ পড়তেই একঝলক্ বিদ্যুতের খেলা, তারপর আঁটোসাঁটো বুকে আঁচলটা টেনে, কোমরে সাংঘাতিক্ একটা মোচড়্ দিয়ে, গুরু-নিতম্বে বড় বড় ঢেউ তুলে সুবালা হাঁটা শুরু করতেই লোকটা পিছু নিল। আঠার মত আটকে রইল, বঁড়শীতে গাঁথা মাছের মত শুরু হলো দৌড়ঝাঁপ্। হাফসার্ট-ধুতি, টাকমাথা-ভুঁড়ি—বছর পঁয়তাল্লিশের একটা ঝানু-হিসেবি মাছ—ঘায়েল করা মুখের কথা নয়। এখানেই সুবালার কেরামতি—প্লাটফর্মের এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত বারকয়েক দৌড় করিয়ে ভাল করে যাচাই করে নিতে হবে শিকার কি চায়, কতখানি চায়। একনজরে জরিপ করে নিতে হবে মক্কেল কোন জাতের। ট্রেনের অপেক্ষায় সময় কাটানোর তাগিদে খচ্চর ক্লাসের বাবু, বাড়ীতে বাচ্চাবিয়োনো ঝোলাবুক-খিট্খিটে মেজাজের পুরোনো বউ—একঘেয়েমি কাটানোর প্রয়াসী বাবু, অফিস-ফিরতিপথে সন্ধ্যের মুখে সুবালাদের পিছনে খানিক ছুঁক্ছুঁক্, ড্যাবডেবে চোখে গিলে খাওয়া, মাঝেমাঝে গলাখাঁ্যাকারি—কিন্তু ঐ পর্যন্তই, ট্রেন এলেই বাবু ভীড়ে মিশে যাবেন, তারপর আবার ভদ্দরলোক, বাড়ী ফেরার পথে পানের দোকান থেকে পঁচিশ পয়সায় তিনটি কিনে নেবেন এবং রাত্তিতে খাওয়াদাওয়ার পর আবার সেই পুরোনো জমিতে নতুন পদ্ধতিতে চাষআবাদ ইত্যাদি। সুবালা এদের ঘেন্না করে, তাই সুযোগ পেলেই কাঁচাখিস্তি দিয়ে মনের ঝাল মেটায়।

কিছু বাউণ্ডুলে হতচ্ছাড়া আছে যাদের চালচুলো নেই, পকেটে পয়সাও নেই অথচ রস ষোলআনা। গায়ে পড়ে ভাব জমাতে চায়, হাসিমস্করা করে। এদের বাগ জানাতে সুবালার মোক্ষম অস্ত্র "মিন্সের রস যে থইথই, সেই যে বলে, পেটে নেই ভাত, নাঙ-এর উৎপাত, পকেট বুঝি গরম। তা আমার রসের নাগর, একপাতা

ঘুগ্‌নী খাওয়াওতো দেখি।' ঘুগ্‌নীর পর চা-পান চারমিনার পর্যন্ত এগোবার আগেই ফুটোকোম্পানী নাগর সরে পড়ে—আপনি বাঁচলে বাপের নাম। সুবালা তখন হি হি করে হাসে, চেঁচিয়ে বলে 'পকেটে পয়সা হলে নাগর আবার এসো।'

তবে উঠতি বয়সের ছোঁড়াদের চাউনি আর রকমসকম সুবালা তেমন বুঝতে পারে না। শুনেছে ওরা অনেক 'নেকাপড়া' শিখেছে অথচ কাজকর্ম জোটাতে পারে না, 'বে থা' করে ঘর সংসার বাঁধতে পারে না, এদিকে বয়স পেরিয়ে যায়। ওরা ধম্মের ষাঁড়ের মত এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়, ওভারব্রীজে জটলা করে, চোখে পাগল পাগল ভাব। সুবালা ওদের দু'একজনকে নেহাৎ কৌতূহলের তাগিদে এক-আধবার 'টেরাই' করেছে, কিন্তু ওরা যেন কেমন—সুবালা ওদের বুঝতে পারে না। পুরুষমানুষের 'পাল খাওয়ার' চোখের ভাষা, অভিজ্ঞা সুবালা ভাল করেই জানে, কিন্তু এদের ছিরিছাঁদ যেন কেমন আলাদা, সুবালা এদের ভয় পায়, এড়িয়ে চলে। একবার তো এই রকম একটা ছোঁড়া তাকে সোজাসুজি ডেকে পাশে বসিয়েছিল। সুবালা উস্‌খুস্ করে বলেছিল 'বাবু এখানে বসে তো কাজ হবে না—সাইডিং-এ যেতে হতে হবে।' তা ছোকরা বলে কি 'কাজকর্মে দরকার নেই, এখানেই বসো।' ওভারব্রীজের সিঁড়িতে লোকজনের চোখের সামনে চড়া আলোয় অমন প্যান্টসার্ট পরা সুন্দর ছোকরার পাশে বসে সুবালার গা শিরশির করছিল, কেমন একটা লজ্জালজ্জাভাব অথচ ছোকরা তাকে পাশে বসিয়ে একেবারে নির্বিকার—মনে হচ্ছিল যেন সে তার ইয়ারবক্সীর সঙ্গে গল্পগাপ্পা করছে, সুবালার মত একটা ডব্‌গা ছুঁড়িকে পাশে বসিয়ে কেমন করে এরা বোম্ মহাদেব সেজে থাকে কে জানে! অথচ আসল মক্কেলদেরতো সুবালার গায়ে গা ঠেকলেই কল্‌কলিয়ে ঘি গলে যায়। গলবারই কথা—সুবালা সত্যিই আগুন! না কালো, না ফর্সা, উজ্জ্বল লোভনীয়-শ্যাম—আর গড়ন! যতকিছু চমৎকারীত্বতো ঐখানেই—দেহের যেখানে যেমনটি হলে পুরুষমানুষের

বাসনার আগুন দপ্ করে জ্বলে ওঠে, ভগবান তেমনটিই অকৃপণভাবে সুবালাকে দিয়েছেন, অথচ আজকাল সারাদিনে কি আর এমন পেটে পড়ে!

আসলে সুবালার স্বভাবটাই ওকে এমন তর্‌তাজা রেখেছে। সে সবকিছু সহজভাবে নিতে পারে। উলুবেড়ের তারাপদ দলুই-এর বিয়ে-করা-বউ সুবালা দাসী 'ভাতারের নাকের ডগা' দিয়ে মজিলপুরের বিশু কাহারের হাত ধরে, দিনের আলোয় ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল। 'ভাত দেবার মুরোদ নেই, কিল মারবার গোঁসাই'—সুবালা তার নেশাখোর, অলস ও আরামপ্রিয় স্বামীর মারধোর করার হাতটা মুচ্‌ড়ে দিয়ে একরাশ ঘেন্নায় থুথু ছিটিয়ে দিয়েছিল। মুখবুজে কিল্‌চড় লাথি সহ্য করে কান্নাকাটি করেনি। তারাপদ লোকটা ছোটলোক হলে কি হবে, নিঃসন্দেহে সংস্কারমুক্ত। আর সব গরীব ছোটলোকদের মত নেহাৎ গোঁয়ারধার্মিক নয়। দাঁতে কুটি কেটে বউ আগলে পড়ে থাকা তার কাছে নেহাৎ নির্বুদ্ধিতা। জীবনটা আজ আছে কাল নেই, ভালমন্দ খেয়ে-পরে, সখ-আহ্লাদ মিটিয়ে নেওয়ার জন্যে নিজের একমাত্র পুঁজি সুবালাদাসীকে সে কাজে লাগাতে চেয়েছিল, খাল কেটে কুমীর এনেছিল—নানারকম দালালি কারবারের দৌলতে মোটামুটি স্বচ্ছল বিশু কাহারকে তারাপদই সুবালার সুকঠিন ঐশ্বর্যের সন্ধান দিয়েছিল—বিনিময়ে কিছু আর্থিক স্বাচ্ছন্দ ও ভরপেট নেশা। কিন্তু বিশু কাহার পাকা বিজনেস্‌ম্যান্। তার হিসেবে তারাপদ তখন অবাঞ্ছিত, মধ্যস্বত্বভোগী, তাই সতেরো দিনের মাথায় সুবালাকে সাইকেল্‌রিক্সা চাপিয়ে বিশু কাহার উলুবেড়ে ছেড়েছিল এবং কোন্নগরে নেতাজী কলোনীতে ঘরভাড়া করে সুবালাকে রাণীর হালে রেখেছিল। তেল-সাবান, স্নো-পাউডার, সাড়ী-ব্লাউজ—কিছুর অভাব রাখেনি। বিশুবাবু ইয়ারবক্সী তথা পার্টি নিয়ে তার বাঁধা-মেয়েমানুষ সুবালার কাছে আসত, দিন দুই তিন ফূর্তির হর্‌রা চলত। সুবালা বেশী করে তেলমশলা দিয়ে ঝালঝাল কষামাংশ রাঁধত; আহ্লাদে

ডগমগ হয়ে গান ধরত 'মন যে আমার কেমন কেমন করে, প্রাণেতে সয়না সখী, নাগর গ্যাছে পরের ঘরে।' বিশুবাবুর বন্ধুরা একবাক্যে 'আহা হা হা, মাইরী মাইরী' করতো এবং সুবালা ও কষামাংশের তারিফ করতো। ঘরের কোণে দেশী বোতলের পাহাড় জমতো আর সবকিছু খরচ-খরচা বাদ দিয়েও পোস্টাপিসের পাশবুকে বিশু কাহারের নামে টাকা জমতো।

তারপর একদিন বিশ্বেসবাবু এলো। নালিকুলের কেষ্ট বিশ্বাস, পাইকারী আলুর ব্যবসায়ী—অঢেল কাঁচাপয়সা। তারকেশ্বর-সেওড়াফুলী মোকামে বিখ্যাত 'আলুরাজ' কেষ্ট বিশ্বাসকে কে না চেনে! ইদানিং বিশ্বাসবাবু অন্য কারবারে টাকা খাটাতে চান। আজকাল বালির কারবার মন্দ নয়। বিশু কাহার বালির লাইনেও অভিজ্ঞ লোক, তাই কারবার-সূত্রে তাকে বিশ্বাসবাবুর সঙ্গে যোগা-যোগ গড়ে তুলতে হয়েছে। বিশুর মতলব—যেমন করেই হোক বিশ্বেস বাবুকে বালির কারবারে নামিয়ে, টাকার অভাবে বন্ধ হওয়া মল্লিক-পুরের খাদ্‌টার কাজ নতুন করে সুরু করলে মোটা টাকার দালালি মারবে। তাই একদিন যথারীতি বিশ্বাসবাবু সমভিবাহারে সুবালা স্বর্গে :

বিশুর পূর্বনির্দেশ মত সেদিন সুবালা সারাদিন ধরে নিজের তেইশ বছরের আঁটসাঁট দেহের ইমারতে তেল সাবানে, স্নো পাউডার আলতায়, নতুন কেনা ব্রেসিয়ার এবং লাইলনের স্বচ্ছ শাড়ীতে আর পানের রসে ভেজা টুকটুকে ঠোঁটের লালে আগুন জ্বালিয়ে রেখেছিল। কিন্তু বিশ্বাস বাবু পাকা জহুরী, ঘণ্টাখানেক ধরে সুবালাকে নাড়াচাড়া করে, কোন রকম উচ্ছ্বাস প্রকাশ না করে, রায় দিয়েছিলেন 'বক্‌নাটা ভালই পুষেছ কাহার, তা জলটল চলে তো হে?' বিশু কৃতার্থ হয়ে বলেছিল 'তা আপনার আদেশে সবকিছুই চলবে বিশ্বেসদা, আপনার সেবা করতে পেলে ওমাগী ধন্য হয়ে যাবে।' বিশুর চোখের ইশারায় সুবালা আলমারী থেকে ফুলকাটা কাঁচের তিনটে গ্লাস আর বিলিতির বোতল

বার করে। বিশ্বাসবাবু মালের সঙ্গে মাছমাংস হাবিজাবি পছন্দ করেন না। একটু ভাল আচার কিংবা চাট্‌নী, নুন, আদার কুঁচি আর দু একটা কাঁচালংকা, ব্যাস্—সুবালা সবই যত্ন করে সাজিয়ে দেয়, হুইস্কির বোতল খুলে গ্লাসে ঢেলে দেয়। বিশ্বাসবাবু সুবালার ভারী পাছার ঢেউ গুণতে গুণতে তার সহবত্‌এর তারিফ করেন। তারপরে নেশা জমে ওঠে, সন্ধ্যে উতরে যায়। বিশুর তখন একটা জরুরী কাজের কথা হঠাৎ মনে পড়ে যায়, বলে 'বিশ্বেসদা, অনুমতি করতে হবে, কোতরং বাজারে একটা তাগাদা আছে, না গেলেই নয়, যাবো আর আসবো, আপনি বিশ্রাম করুন, সুবালা রইলো—আপনার সেবাযত্নের কোন ত্রুটি হবে না, সুবালার চোখে চোখ রেখে গ্রীন সিগন্যাল দিয়ে সে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ে। 'আলুরাজ' কেষ্ট বিশ্বাস মনে মনে বিশু কাহারের বুদ্ধির তারিফ করেন—ছোকরা নিশ্চয়ই উন্নতি করবে। তারপর ঘণ্টাদুয়েকের কঠিন পরীক্ষায় সুবালাদাসী অনেক নাম্বার পেয়ে সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়। বিশ্বাস বাবু আপশোষ করেন, 'মানুষ ভালো জিনিসের কদর বোঝে না।' বেশ বুঝতে পারেন, ঐ দালাল ছোকরা একে ভাঙ্গিয়েই কারবার চালাচ্ছে। 'আলুরাজ' সিদ্ধান্ত নেন 'এমন সামগ্রী পাঁচহাতে পড়ে, অযত্নে অবহেলায় চোখের সামনে নষ্ট হবে'—সে তিনি সহ্য করতে পারবেন না।

জরুরী কাজ সেরে বিশু কাহার যখন ফিরে আসে তখন রাত সাড়ে দশটা। বিশ্বাসবাবুর একটা মস্ত গুণ—কোথাও রাত-কাটান তাঁর পোষায় না। যত রাত্রিই হোক বাড়ী ফেরা তাঁর চাই। না হলে নিজেকে তাঁর কেমন যেন 'চরিত্তিরহীন' মনে হয়। তাই, লাস্ট্‌ট্রেন ধরতে ফিরতি পথে রিক্সায় বিশ্বাসদার পাশাপাশি বসে বিশু ঠিক সময় মতো তার মনের কথাটা পাড়ে—সেই মল্লিকপুরের বালিখাদের কথা। বিশ্বাস বলেন, 'ঠিক আছে, পার্টিকে কাগজপত্র নিয়ে চক্‌বাজারে একদিন আমার সঙ্গে দেখা করতে বলো, ভেবেচিন্তে দেখি কি করা যায়।' তারপর যেন হঠাৎ মনে পড়েছে, 'শোন ভায়া, একটা কাজের

কথা বলি। তারকেশ্বরের নারকেলবাগানে আমার আড়ৎ-বাড়ীতে পাঁচটা নামীদামী লোকজন আসে। তাদের আদরআপ্যায়নের জন্যে একটা কাজের 'মেয়েমানুষ' দরকার। তোমার এটি তো দেখলাম বেশ চালাক-চতুর, এদিকে গায়ে-গতরেও আছে—কাজ চলে যাবে। কাল সনাতন আসবে ওর সঙ্গে পাঠিয়ে দিও। তুমি তো জানোই ভায়া, মনে ধরলে কেষ্ট বিশ্বেস খরচা-পাতির পরোয়া করে না।' বিশু জিভ্ কাম্ড়ে বলে, 'ছিঃ ছিঃ, কি বলছেন বিশ্বাস দা, আমার মত চুনোপুঁটি লোক আপনার কাছে খরচার কথা তুলে ধৃষ্টতা করতে পারে! আপনি থুথু ফেললে লাখ টাকা বেরোবে। আপনার সেবাযত্নের সুযোগ পাবে সে তো মাগীর ভাগ্যের কথা। আপনি বিবেচনা করে যা দেবেন তাতেই আমার আরো পাঁচটা মেয়েমানুষ রাখার খরচ উঠে যাবে—আপনার নজর কত উঁচু তা কি আর জানি না দাদা!' বিশ্বাস বুঝতে পারেন যে ছোকরা চালাকের চালাক, পাক্কা দালাল—দামটা একটু বেশীই হাঁকতে চাইছে। রিক্সাতেই সুবালাদাসীর কেনাবেচার পাট চুকে যায়।

তারপর শুরু হয় নারকেলবাগানে সুবালার জীবনের সবচেয়ে সুখের তথা সবচেয়ে ঘেন্নার দিনগুলো। প্রথম প্রথম গর্বে সুবালার বুক ভরে যেত। 'বাবু কাকে বলে দেখে যাও'। বিশু কাহারের ছিল দালালি ব্যবসা—মাছের তেলে মাছ ভাজা—সুবালা বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু কেষ্ট বিশ্বাসের টাকাও যেমন অঢেল খরচাও করে দরাজ হাতে—খাওয়াপরা, জীবনে সত্যিকারের ভোগসুখ কাকে বলে—বিশ্বাসবাবুর হাতে না পড়লে সুবালা তা কোনদিন জানতে পারতো না। তবে হ্যাঁ বিশ্বাসবাবুর ধকল সহ্য করা যার তার কম্ম নয়। কতরকমের উল্টো-পাল্টা ব্যাপার, এক এক দিন এক এক রকমের খেলা, মাগো, ভাবতেই সুবালার গা ঘুলিয়ে আসে। এপর্যন্ত কত মানুষ সুবালার ওপর দিয়ে পার হলো, কিন্তু কেষ্ট বিশ্বাসের মত অমন পিশাচবিত্তি করতে কাউকে সে দেখেনি। এমনিতে মানুষটা বেশ, যা আবদার করবে

তা যত টাকা লাগুক মুখের কথা একবার খসালেই হলো, তৎক্ষণাৎ এসে যাবে। কিন্তু রাত্তিরে বিশ্বাসের মূর্তি আলাদা। কাজকর্ম সেরে সুযোগমত যেদিন বিশ্বাসবাবু সুবালার কাছে সেবাযত্নের জন্যে আসেন সেদিন যেন তার গায়ে জ্বর আসে। তারপর তিন দিন যায় তার ধকল সামলাতে। এতসুখে থেকেও কেষ্ট বিশ্বাসের কাছে 'মেয়েমানুষ' কেন বেশীদিন টেকে না তার কারণটা কালক্রমে সে বুঝতে পারে। 'মরণ, মরণ, এমন সুখে কাজ নেই, এর থেকে হাত পুড়িয়ে রেঁধে খাওয়া ভাল'···সুবালার অমন পাথরের মত চেহারার রস শুকিয়ে একেবারে ছিবড়ে! তবু পাকা দুটি বছর কাটিয়ে কেষ্ট বিশ্বাসের 'মেয়েমানুষদের তালিকায়' রেকর্ড সৃষ্টি করে সুবালা এখন স্বাধীনভাবে পথে নেমেছে।

সুবালা এখন স্বাধীনতার স্বাদ বুঝেছে। কাজ কর না কর, খাও না খাও—সবই নিজের ইচ্ছামত, কারও কিছু বলার নেই। তারাপদ দলুই, বিশু কাহার কিংবা কেষ্ট বিশ্বাস—কাকে ঘরে আনবে সেটা নির্বাচন করবে সুবালা নিজেই। তারপর ঘরে ডেকে আনা মানুষটাকে শাসন করবে সোহাগ করবে নিজের মর্জিমত। নিজের ইচ্ছের এই স্বাধীনতা তার কাছে এক মধুর মুক্তির স্বাদ বয়ে এনেছে। একে শোষণমুক্তি বলা চলে কিনা কে জানে! তবে সুবালা এখন আত্ম-বিশ্বাসে ভরপুর। মাসকাবারে স্টেশনে জি. আর. পি'র বড় বাবুকে যখন বরাদ্দ টাকা দিতে যায় তখন সে ভাবে তার এই টাকায় হয়তো ছাপোষা দারোগার সংসার খরচা চলবে। কর্তৃত্বের একটা আত্মতুষ্টি ভাব তাকে অনেক তেজী করে দেয়—সে এখন অন্যের ইচ্ছায় চলে না, তার ইচ্ছেতেই অন্যেরা চলে।

এইতো এখনই সুবালার ইচ্ছেতে একটা মাঝবয়েশী-ভুঁড়িওয়ালা বাবু কেমন পুতুল নাচছে! সুবালার হাসি পায়, তবু সে সতর্কও হয়। বেশী সময় নিয়ে খেলালে অন্যমনস্কতার সুযোগে সুতোর টান আল্‌গা হয়ে মাছ ফস্‌কে যেতে পারে। তাই, ওভারব্রীজের আলো-আঁধারীতে সে এবার দাঁড়িয়ে পড়ল এবং বাবুটা কাছাকাছি হতেই ফর্মুলা মত

অগ্রসর হলো 'কটা বাজল বাবু?' বাবু টাইম্ জানাতে অনেকখানি কাছে এগিয়ে এল, তারপর,

ঃ যাবেন নাকি?

ঃ ইচ্ছেতো ছিল, যা দৌড় করাচ্ছো।

ঃ কেষ্ট পেতে হলে কষ্ট করতে হয় (হাসি) কতক্ষণ থাকবেন?

ঃ সাড়ে নটার গাড়ী ধরবো, কতক্ষণ আর—এই ধর···ঘণ্টা-খানেক।

ঃ দশটাকা লাগবে।

ঃ বল কি গো! দশ টা···কা!

ঃ ভাল জিনিসের দাম একটু বেশীই লাগে (হাসি), ঠিক আছে ছটাকা দেবেন আর একটাকা জি. আর. পি.র।

এবার দৃশ্যপট পরিবর্তন। সুবালা হাওয়ায় আঁচল উড়িয়ে আগে আগে, এদিকওদিক তাকিয়ে টাক্‌মাথাবাবু পিছনে, প্লাটফর্মের প্রান্ত ছাড়িয়ে ওরা মিলিয়ে যায় 'অন্য পৃথিবীতে'। আমাদের চেনা প্লাট-ফর্মের বহমান্ স্রোতে আবার ট্রেন আসে, থামে, ছেড়ে চলে যায়। হয়তো তখনও ওভারব্রীজের নীচে আলো-আঁধারীতে 'আর এক সুবালা' ব্যস্ত থাকে শিকার-খোঁজার নিরন্তর পথ-পরিক্রমায়। আবার সিগ্‌ন্যালটা লাল থেকে হলুদ হয়, আরেকটা ট্রেনের ঘণ্টা বেজে ওঠে।

———

ভীড়ে আত্মপ্রকাশ

সস্তায় উপাদেয় টিফিন্ করার ধান্দায় রোজকার মত রাস্তার ধারের ফেরিওয়ালাদের আশেপাশে ঘুরঘুর করছিলাম। মেজাজটা শরিফ্—আগামী গ্রীষ্মের মরশুমে অফিসের জল রাখার জন্য আড়াইশো মাটির কুঁজো সাপ্লাই করার অর্ডারটা হাতাবার তালে এক বেটা সাপ্লায়ার নগদ দশ টাকা আমার বাঁ পকেটে গুঁজে দিয়ে গেছে। সুতরাং বেপরোয়া হয়ে এক ফলওয়ালার আপেলের ঝুড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম। মিনিট পনের বাদ-বিচারের পর একশ গ্রামের বেশী না হয় এমন একটা আপেল কিনে আট পিস্ করে ঠোঙায় ভরে নিয়ে পার্ককরা একটা অ্যামবাসাডারে হেলান দিয়ে খেতে খেতে ভীড়টা চোখে পড়ল। ভীড়টা ছোটখাটই—জনাপঞ্চাশেক লোকের একটা বৃত্ত ইলাকা হাউসের সামনের ফুটপাথ থেকে কখনও রাস্তায় নামে, কখনও লায়নস্ রেঞ্জ ধরে খানিকটা এগিয়ে চলে, আবার ফিরে আসে। আমার কৌতূহল এসব ব্যাপারে একটু বেশীই। তবুও ঠোঙাটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধরতেই হলো। আট টাকা কেজি আপেলের স্বাদটা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতে চাইলাম। তাছাড়া আগে অনেকবার ঠকেছি। কোথাও হয়ত ভীড় দেখে অবশিষ্ট কয়েকটা বাদাম সহ ঠোঙাটা ফেলে দিয়ে ভীড়ের মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখেছি হয়ত একটা লোক রাস্তায় চক্‌খড়ি আর কাঠকয়লা দিয়ে মাকালীর ছবি আঁকছে, আর তাই দেখতেই কয়েকশো লোক! আরে বাবা, ওতে দেখার কি আছে! শিল্প না ছাই! মা কালীর পট তো সকলের ঘরেই আছে, তা কি কোনদিন অমন হাঁ করে মনপ্রাণ দিয়ে দেখে? কখনও ভীড়ের মধ্যে কাওয়ালী গানের আসর, তাড়াহুড়ো করে উঁকি মারি। একটা নোংরা বুড়ি ঢুল্‌কী বাজাচ্ছে আর ততোধিক নোংরা একটা ডব্‌কা ছুঁড়ি একহাত কানে দিয়ে আর এক হাত প্রসারিত করে

চোখ বুজে বেগম্ আখতারের স্টাইলে গান ধরেছে। এদিকে আমার পকেট থেকে একটাকা তিয়াত্তর পয়সা বেমালুম হাওয়া। কোথাও ভীড়ের মধ্যে উঁকি মেরে দেখি একটা লোক মাটির মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে কয়েক ঘণ্টা নাকি রয়েছে! এই দেখার জন্যে আলুকাবলীর শাল-পাতাটা চাট্‌পোট্ করে না খেয়ে তাড়াতাড়ি ফেলে দেওয়ার কোন মানে হয় না। সুতরাং আমি কালক্রমে ধৈর্য ধরতে শিখেছি। এই যে এখন আপেলের অষ্টম তথা শেষ পিস্‌টা মুখে ফেলে, নির্বিকার চোখ দিয়ে ঠোঙার লেখাগুলো পড়ছি, এটাও আমার অনেক দিনের অভ্যাসের গুণ। অবশ্য আগের অনেক অভ্যাস পাল্টে ফেলেছি। যেমন, ছোটবেলায় মুড়িটুড়ি খাবার পর খালি ঠোঙাটাকে ফুঁ দিয়ে ফুলিয়ে সশব্দে ফাটিয়ে আওয়াজ করে আনন্দ পাওয়ার এবং আশে-পাশের লোককে চম্‌কে দেবার অভ্যাসটা এখন আর নেই। তার বদলে যেখানে যা পাই, পড়ে ফেলি। তাতে বেশ মজা পাই এবং অনেক কিছু সংগ্রহও হয়ে যায়। যেমন আমার হাতের এই ঠোঙাটার অবয়ব একটা বাংলা দৈনিকের একটি অংশ থেকে তৈরী হয়েছে এবং ভাগ্যক্রমে এতে একটি মূল্যবান বক্স খবর রয়ে গেছে। ডাক্তারদের গ্রামে যাওয়ার ব্যাপারকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য পশ্চিম-দিনাজপুরের জনৈক ছাত্রের অভিনব অভিমত—অধিক সংখ্যক সুন্দরী, তরুণী নার্সদের গ্রামের হাসপাতালগুলোতে পাঠিয়ে একটা পরীক্ষামূলক কর্মসূচী গ্রহণের প্রস্তাব।

অবশ্য সব সময় এমন চটক্‌দার খবর, হ্যাণ্ডবিল বা বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে, তাও নয়। সাংঘাতিক নোংরা পাবলিক ল্যাভেটরীতে বাধ্য হয়ে ঢুকে, হিস্ করার ঐ অল্প সময়টুকুর মধ্যে অন্যমনস্কভাবে 'মাসিক বন্ধে অশোকাভিটা, দৈবশক্তি নারায়ণ কবজ, স্বপ্নদোষ, ধ্বজভঙ্গ, শুক্রতারল্য, গনোরিয়া, শিফিলিসের অব্যর্থ আরোগ্য—সত্বর যোগাযোগ করুন,' কিম্বা সিনেমা হাউসে পঁচাত্তর পয়সার টিকিটের

লাইনে দাঁড়িয়ে দেওয়ালের গায়ে, কাঠকয়লার আঁচড়ে লেখা 'মদন ও শেফালী' তার নীচেই অন্যএকজনের হাতের লেখা—

'শেফালীর ফালি ফালি
মদন এবার হোঁচট্ খেলি'

নিঃসন্দেহে-অশ্লীল কাব্যিক এবং আমার কাছে নিতান্তই আকর্ষণীয়। এমন কি দীঘায় সমুদ্রতটের ঝাউগাছের গোড়ায় ছুরি দিয়ে লেখা—

"স্বপ্না তুমি আমার"

—সুশোভন্ (মণ্টু),
গোয়াবাগান, কলিকাতা।

এও আমার চোখে পড়ে।

এসব কথা যাক্। এবার আমায় ভীড়ের ব্যাপারটা দেখতে হবে। ইতিমধ্যে অবশ্য, ভীড়ের বৃত্তটা আমার কাছাকাছি এসে পড়েছে। গলাটা যতদূর সম্ভব লম্বা করে (এই সময় আমাকে নিশ্চয়ই কেঁচো বকের মত দেখতে হয়।) উঁকি মেরে যা দেখলাম তা সত্যিই একেবারে টাট্‌কা-নতুন। বুঁচি ও বুঁচির মায়ের লড়াই চলছে। দুজনে পরস্পরের চুলের মুটি দুহাতে এমন শক্ত করে টেনে ধরে আছে যাতে উভয়ের মাথা দুটো প্রায় একসংগে ঠেকে গেছে এবং উভয়ে উভয়কে বিপরীত দিক থেকে দাঁড়ানো অবস্থায় ক্রমাগত ঠেলে চলেছে। যে পক্ষ যে মুহূর্তে কিছুটা দূর্বল হয়ে পড়ছে সেই মুহূর্তে সে পিছু হট্‌তে বাধ্য হচ্ছে। সম্ভবতঃ এই কারণেই ভীড়টা চলাফেরা করছিল। কেন এই লড়াই তা কেউ জানে না। জানার প্রয়োজনও নেই। শুধু 'লড়াই লড়াই লড়াই চাই, লড়াই করে বাঁচতে চাই'—মুখস্ত এই শ্লোগান্‌টা আমি বিড়্‌বিড়্ করে কয়েকবার আউড়ে গেলাম। মাঝে মাঝে আমার এমন হয়। কিছু মনে পড়ে গেলে এই রকম বিড়্‌বিড়্ না করে স্বস্তি পাই না। এসব নিজের কথা আপাততঃ মুলতুবি থাক, কেননা, ওদিকে মা-বেটির ফাইটিং বেশ জমে উঠেছে। চুলে টান পড়ায়, যন্ত্রণায় উভয়ের চোখেই জল, সমস্ত শিরা উপশিরা একেবারে টান্‌টান্—বীভৎস

মুখে অশ্রাব্য শব্দ—উভয়েই স্ত্রী জাতীয়া হয়েও পরস্পরের পক্ষে অসম্ভব একটি বিশেষ যৌনকর্ম সম্পাদনের বিকট্ আস্ফালন—এক ধরনের গর্জনও বলা যায়। বেওয়ারিশ স্বগোত্রীয় ভিখারীর দল, আশপাশের অফিসের রাষ্ট্রভাষাভাষী দ্বারোয়ান—বেয়ারা, সম্প্রদায়, জুতোপালিশ্ওয়ালা, চানাওয়ালা এবং আমার মত কিছু বাবু (খচ্চর-ক্লাসের) এই মজাদার ফাইটিং দৃশ্যের উত্তেজিত দর্শক। ইতিমধ্যে দর্শকদের মধ্যে তুটো দল হয়ে গেছে এবং মোহনবাগান ও ইষ্ট বেঙ্গলের সমর্থকদের মত নিজের নিজের পক্ষকে সমর্থন করে সোল্লাসে মদত দিচ্ছে।

এই বুঁচিকে রোজ রোজ দেখে আমি প্রায় চিনে গেছি। কেন মিথ্যে কথা বলব—এই নাতুস্নুতুস্ মাদী রামছাগলের মত ডব্কা ভিখারী মেয়েগুলো আজকাল সুন্দরী ফিট্ফাট্ ভদ্রমহিলাদের থেকেও আমার বেশী সময় নষ্ট করায়। বন্ধুবান্ধবদের বলি না, কারণ, শুনলেই তারা বলবে 'শালা পার্ভার্টেড্' যেমন আমিও সুযোগ পেলেই বন্ধুবান্ধবকে আক্রমণ করি এবং নিজেকে একজন পবিত্রটবিত্র গোছের মাল প্রতিপন্ন করার পাবলিসিটি চালাই। এই বুঁচিকে রোজই দেখি, কখনও পানওয়ালা রামজনমের সংগে হাসাহাসি করতে, কখনও ডিম-ওয়ালা সতীশের সংগে চোখের তারা নাচিয়ে ছেনালী করতে আবার কখনও দেখি কোমর তুলিয়ে রাস্তা পার হয়ে চার্চের পশ্চিমদিকের গাছ-তলায় অয়েলপেপার, চট ও দড়ি দিয়ে তৈরী অদ্ভুত আস্তানার দিকে এগিয়ে যেতে। আমি ভেবে পাই না কি খেয়ে পথের এই গোত্রহীন মেয়েমানুষগুলো এমন নধর চেহারায় সেক্স ছড়িয়ে রেখেছে।

এবার দেখি ভীড় ফর্সা। মাঝখানে পেটমোটা কনস্টেবল শিউ নারায়ণ লাঠি ঘুরিয়ে তুই বিবাদমান পক্ষকে সামাল দিচ্ছে। বুঁচির মায়ের উর্ধাঙ্গ সম্পূর্ণ অনাবৃত! লাউয়ের মত নদ্বদে স্তনতুটো মাধ্যাকর্ষণের নিয়মে প্রায় পেটের কাছে পৌঁছেছে, সে হাত পা নেড়ে ভাগলপুরী লাশ কাঁপিয়ে কিসব যেন বলছে। অবশ্য সেদিকে

দর্শকদের কারও তেমন নজর নেই, কারণ, অন্যদিকের আকর্ষণ তখন রীতিমত দুর্লভ—বুঁচির নীল কাপড়ের ব্লাউজ, সামনের দিকটা অনেকখানি ছেঁড়া, তার উদ্ধত যৌবন জোরে জোরে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের উত্তেজনায় ভীষণ আন্দোলিত যা দর্শকদের অনেক 'এ' মার্কা সিনেমা দেখার খরচ বাঁচিয়ে দিতে পারে।

ঠিক এই সময় আমার এক মুসলমান বন্ধুর ছোটবেলার রোমান্টিক আশাভঙ্গের এক অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ে গেল যা ঐ বন্ধুই আমায় একদিন বলেছিল। বন্ধুটি তখন বয়ঃসন্ধির বয়স সবে পার হয়েছে। পাশের বাড়ীর একটি কিশোরী মেয়ের জন্য সে রীতিমত আকর্ষণ অনুভব করে। একদিন সুযোগমত প্রেমনিবেদন, ঘনিষ্ঠ-আলিঙ্গন ইত্যাদি, তারপর এক বিশেষ আবেগঘন মুহূর্তে মেয়েটির মুখ থেকে একটি প্রশ্ন--'ওগুলায় অত হাইত্ দাও ক্যান ? দুটা গোস্তের ওত্‌রা (মাংশের ডেলা) দলামলা কইর‍্যা কি সুখ পাও—বুঝি না !' কথাটা আজ এখনই কেন যে আমার মনে পড়ল তা বলতে পারব না। তবে একথা ঠিক, দলামলা করনের একরকম সুখ আর চোক্ষু দিয়া গিল্যা খাওনের আর একরকম সুখ। অবশ্য বায়োলজীর এত সব প্যাঁচ-প্যাঁয়জার আমার সেই বন্ধুর ছেলেবেলার গ্রাম্যপ্রেমিকা, সেই কচি খুকিটি বুঝবে কেমন করে! আমার মত সাতচল্লিশ ঘাটের জল খাওয়ার মানুষতো সবাই নয় এবং এই সত্তর দশকের মাম্‌দোবাজির সুলুক্-সন্ধান জেনে ঠিকঠাক টোপ্ ফেলে 'ধরি মাছ না-ছুঁই পানির' বিবেচনা জ্ঞান সকলের থাকার কথাও নয়। তাই, এই বাজারে হাড়মজ্জা চুষে খেয়ে দিব্যি ভেজিটেরিয়ান্ সেজে বাহবা যারা নিতে পারে তারাই বিদগ্ধ 'অ্যাঁতেলেক্‌চ্যুয়াল্'। তা না হলে এই অফিসপাড়ার দিনদুপুরের মজাদার ফাইটিং দৃশ্যের উত্তেজিত দর্শকজনতার যুবা, প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধেরা আমার মত্ত কবুল্ করুক তো দেখি, বুঁচির খোলা-বুকের উদ্ধত অসমতলের খয়েরীবৃত্তে চোখ আট্‌কে দিয়ে, 'গিল্যা খাওনে' সুখ হয় কিনা! ট্যাক্স ফ্রি এণ্টারটেন্‌মেণ্ট—রোগটোগ,

বদনাম বা পেঁদানীটেদানী—কোন কিছুরই ভয় নেই। শুধু ভীড় দেখে দাঁড়িয়ে পড়লেই হল। তারপর সাত্‌সতেরো হরেক্‌ রকম মজা লোটা (পকেট সামলে) আর সুখ পাওয়া।

ভীড় এক আশ্চর্য আশ্রয়—আত্মপ্রকাশ ও আত্মবিকাশের—অথচ অটুট্‌ নিরাপত্তা—যা কাউকে চেনায় না বা চিনতেও দেয় না। শুধু আয়নায় মুখ দেখে নিজেকে চিনে নেওয়ার মত কিছু নিটোল্‌ মুহূর্ত বিলিয়ে দেয়। আমি একজন পাকা আত্মবিলাসী, সুযোগ কখনও নষ্ট হতে দিই না। ভীড়ের আয়নায় নিজের মুখ দেখে আধঘণ্টার টিফিন দেড়ঘণ্টায় শেষ করে অফিসে ফিরে নিজের চেয়ারে বসি, চারমিনার ধরাই, হাই তুলি, শরীরের ম্যাজ্‌মেজে ভাবটা কাটানোর তাগিদে আমার সতীলক্ষ্মী বৌ-এর কথা মনে পড়ে যায়, সেই সংগে দুশোগ্রাম আমসত্ত্ব কিনে নিয়ে যাওয়ার ফরমাসও। ড্রয়ার থেকে টেবিল ক্যালেণ্ডারটা বার করে অর্ধাঙ্গিনীর 'সেফ পিরিয়েডের' হিসাব মেলাতে থাকি, ছুটির ঘণ্টা এগিয়ে আসে। একজন সত্যিকারের লোকের মত লিফ্‌টে্‌র আয়নায় চুলটুল ঠিক করে মুখটুখ রুমালে মুছে নিই, অফিসের পাঁচটি ইউনিয়নের সবচেয়ে জুনিয়ারটির একজন উঠতি নেতাকে হাতের কাছে পেয়ে 'বিরোধী ভূমিকায় আন্দোলন-টান্দোলন জোরদার ইত্যাদি' করার তাগিদ্‌ (উস্কানি) দিই, তারপর আবার সুন্দরী কলকাতার ফ্লুয়োরেসেণ্ট আলোর নীলাভ জনতার ভিড়ে আত্মপ্রকাশের বিলাসে গা ভাসিয়ে দেওয়া—এক অদ্ভুত গতিহীন গতিময়তা! সোজা কথা হলো, অধিকতর আকর্ষণীয় তেমন কিছু হাতের কাছে না পেলে, ভীড়ের এই আমরা এমনি করেই সত্তর দশক তথা বিংশ শতাব্দীও পার করে দিতে পারি!

নিমাইতীর্থের 'গঙ্গাপুত্তুর'

'বলহরি হরিবোল্'······সমবেত কণ্ঠের হরিধ্বনি। যদিও তেমন জোরালো নয়, হয়ত মাইলখানেক দূরে, বিশালাক্ষ্মীতলার কাছে, চৌরাস্তার ওপারে, তবুও ঘুমের মাঝেই চামেলী শুনতে পায়, জেগে ওঠে। মাঝে মাঝে ভুলও হয়, মনের ভুল, ঘুমটা পাত্‌লা হয়, শব্দটা আবার শোনার জন্যে কিছুক্ষণ অপেক্ষা, তারপর আবার তন্দ্রার আচ্ছন্নতা থেকে গভীর ঘুমের মাঝে চলে যাওয়া। 'বলহরি হরিবোল্' সেইসঙ্গে গুণ গুণ কীর্তনগানের গুঞ্জন, খোলের তাধিন্ নাধিন্ এবং খঞ্জনীর টিন্ টিন্ ঠিন্ ঠিন্···না আজ আর মনের ভুল নয়! ধড়্মড়িয়ে উঠে বসে চামেলী, মা গঙ্গা সদয় হয়েছেন, মড়া আসছে। হরিনাম সংকীর্তনের দল আসছে, নিশ্চয়ই বড়লোক মড়া। আজ দুটো পয়সার মুখ দেখা যাবে।

গঙ্গাতীরের নিমাইতীর্থের ঘাট, এই অঞ্চলের একমাত্র বনেদী শ্মশানের ডোম্ ভাগবতের বৌ চামেলীর প্রতি মা গঙ্গা সদয় হয়েছেন ···মড়া আসছে। 'হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হরে হরে' আসছে সংকীর্তনের দল। অথচ লোকটা কেমন মজা করে অঘোরে ঘুমোচ্ছে দেখ! কদিন একদম রোজগার নেই, সংসার চালানোর ভাবনায় চিন্তায় চামেলীর চোখেও ঘুম নেই। সবসময় কান দুটো 'বলহরি হরিবোল' শোনার জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছে। লোকে বলে 'রাবণের চিতা নেভে না', কিন্তু কি দিনকাল যে পড়েছে! গত দুদিন তো চারটে চিতার একটাও জ্বলেনি। শুধু একটা সাতমাসের বাচ্চা, ডাক্তারবদ্যি করতে পারেনি, পেটের রোগে মরা, কাঁথাজড়িয়ে অল্প-বয়েসী বাপ্‌টা নিয়ে এসেছিল। অতটুকু মড়া তো আর পোড়ানো হয় না, পুঁত্‌তে হয়েছিল···সাকুল্যে পাওনা হয়েছিল এগার টাকা, চামেলীর হাতে এসেছিল মোটে দুটি টাকা। অথচ মানুষটার

আক্কেল বলে কিছু আছে নাকি! রাতদিন 'চুল্লু' টানবে আর মজা করে ঘুম মারবে। পয়সা নেই, 'কুছ পরোয়া নেহি'···বংশীর মালের দোকানে ধার-বাকিতেও ঐ 'ছাইপাঁশ' ঠিক গেলা চাই।

'বলহরি হরিবোল' শব্দটা এগিয়ে আসে। চামেলী, পাশে ঘুমিয়ে থাকা ভাগবতকে ধাক্কা দেয় 'হেই গঙ্গাপুত্তুর, হেই মুর্দা উঠ্, মহাজন আগেয়ি, আরে হেই···।' জমাট নেশার ঘুম ভাগবতের, অত সহজে ভাঙ্গানো যাবে না। তাই এবার কিল চড় চুলটানা এবং শেষে কুঁজোর ঠাণ্ডা জলের অস্ত্র প্রয়োগ করতে হয়। অতঃপর ভাগবতের জড়িত কণ্ঠ 'কোন্ হ্যায় বে, নিদ্‌কা টাইম্‌মে দিল্লাগী করতা।' কিন্তু এরপর চামেলীকে আর 'পরিশান্' করতে হয় না, কারণ 'বলহরি হরিবোল' এবং 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ' উচ্চগ্রামে। মহাজনকে কাঁধে চাপিয়ে শব-বাহকের দলটা নিমাইতীর্থে পৌঁছে গেছে। শুক্‌তারাটা জ্বল্‌জ্বল্ করছে, গঙ্গার ওপারে ইছাপুরের চট্‌কল আর গাছগাছালির ফাঁকে পূবের আকাশে রূপো গল্‌তে শুরু করেছে, হয়তো একটু পরেই কাক ডাকবে। চোখেমুখে একটু জল দিয়ে তেলচিটে গেঞ্জিটা গায়ে চাপিয়ে একটা বিড়ি ধরিয়ে ভাগবত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসে।

'ঐতো গঙ্গাপুত্তুর এসে গেছে' শববাহক দলের একটি লোক এগিয়ে আসে। তাকে দেখেই ভাগবত বুঝতে পারে কোন্ এলাকার মড়া এসেছে। প্রায় প্রত্যেক দলেই এমন একজন 'বোনাফাইড' লোক থাকে যে তার এলাকার কেউ ইহলোক ত্যাগ করলেই তাকে কাঁধে তুলে নেয়, পুণ্যের লোভে কিংবা অন্য কোন ভাললাগার টানে এরা আজীবন শবানুগামী হয়, তা কে জানে! যেমন এই দলের ষষ্ঠী চরণ সিঙ্গুর এলাকার বিখ্যাত পেশাদার মড়া-পুড়িয়ে, একজীবনেই সেঞ্চুরী পার করে দিয়েছে, এই নিয়ে একশ একুশ। ভাগবত বলে 'ষষ্ঠীদা যে, কি খবর, কেমন আছেন, আমার কি ভাগ্যি আজ, অনেক রোজ বাদে দাদার দেখা মিলল।' ষষ্ঠীচরণ বলে "আমাদের গ্রামের 'ঘোষকত্তাকে' নিয়ে এলাম, আটাত্তর পার হয়েছেন, তবু লাস্ কাকে

বলে তা আজ তোমায় দেখাব ভাগবতভায়া। তাড়াতাড়ি সবকিছুর ব্যবস্থা কর, সারারাত জাগা চলছে। 'কত্তার' তিন ছেলে, দু জামাই পাঁচ নাতি আর ঐযে সব পাড়ার ছেলেছোকরারা—জনাত্রিশেক এসেছি অথচ 'কত্তাকে' বয়ে আনতে ছোকরাদের দম্ ফুরিয়ে গেছে।" ভাগবত বলে "এতো বহুত সুখের মুর্দ আছে ষষ্ঠীদাদা। আগের যুগের সব খাঁটি আদমী লোকতো ভারী হবেই, এখন তো সব ভেজালের জামানা।" টালী-ছাওয়া অফিস ঘরের তালা খুলে দেয় ভাগবত। ষষ্ঠীচরণ ও পরলোকগত ঘোষকর্তার মেজজামাই পরিমল বাবু, যিনি এই দলের সবচেয়ে বিজ্ঞ এবং টাকাপয়সা ও অন্যান্য দায়-দায়ীত্ব যাঁর উপর, তিনি ছাড়া আর সকলেই ঘোষকত্তাকে কাঁধে চাপিয়ে ঢালু সিঁড়ি দিয়ে এগিয়ে যায় গঙ্গার পাড়ে 'মহাস্থানের' দিকে।

শ্মশানঘাটের অফিসঘর, তাই তার চেহারাটাও বিচিত্র। সারা ঘর জুড়ে কাঠের স্তূপ, পাটকাঠি বাঁশকঞ্চির বোঝা আর স্তূপাকার পুরোনো ছেঁড়া-ফাটা সাইকেলটায়ার, চিতার আগুন ধরাতে প্রথমেই যেগুলির প্রয়োজন অপরিহার্য। ঘরের এককোনে একটুখানি ফাঁকা জায়গায় একটা মাদুর পাতা। তার উপর সিঁদূর মাখানো কাঠের ক্যাসবাক্স আর রেক্সিন্-বাঁধাই মস্ত এক জাব্দা খাতা···'বার্নিংঘাট রেজিষ্টার', ভবেরহাটের খেলা শেষ হওয়ার শেষ রেকর্ড আর ঘাট-বাবুর অনুপস্থিতিতে এই রেকর্ড লেখা হবে ভাগবতের আঁকাবাঁকা অক্ষরে···তাং ৪. ৯. ২০ (বাং ১৮ই ভাদ্র, ১৩২০) সময়ঃ ভোর ৫-১৫ মিঃ, পৃষ্ঠা নং ৩২১, ক্রমিক নং ৬৪১৮, মৃতের নামঃ মতিলাল ঘোষ, পিতাঃ ৺বটকৃষ্ণ ঘোষ, সাং: গোপালপুর, পোঃ ঐ, থানাঃ সিঙ্গুর, জেলাঃ হুগলী, বয়সঃ ৭৮, মৃত্যুর কারণঃ হার্টফেল, ডাক্তারি সার্টিফিকেট্ঃ আছে, মন্তব্যঃ স্বাভাবিক। রেজিষ্টারের লেখাজোখা শেষ, এরপর রসিদ লেখা···মিউনিসিপ্যালিটির ট্যাক্স ৫ টাকা, বাঁশকাঠ ইত্যাদি ২০ টাকা, গব্যঘৃত-রম্ভা-আতপ্‌চাউল-তিল-তুলসী-মৃৎপাত্র

ইত্যাদি ৫ টাকা, গঙ্গাপুত্র ৫ টাকা এবং ব্রাহ্মণ-দক্ষিণা ৫ টাকা—সাকুল্যে ৪০ টাকা। প্রিয়জনের শেষকৃত্যে চন্দনকাঠ চাইবে, তাও মিলবে। তবে চার্জ একস্ট্রা। খাঁটি চন্দন কাঠ ২০ টাকা কে.জি., ঐ মাঝারি ১২ টাকা কে. জি., ঐ নিম্নমানের (চন্দনকাঠ কিনা সন্দেহ আছে) ৮ টাকা কে. জি.···সুদক্ষ হাতে, কাজের ফাঁকে ফাঁকে সব কিছুই ভাগবত জানিয়ে দেবে।

তিনশ পঁয়ষট্টি দিনে বছর, আর এমনি ষোলটি বছরের এই পেশার সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার সঞ্চয় নিয়ে নিমাইতীর্থের 'গঙ্গাপুত্তুর' ভাগবত যেমন দক্ষ তেমনিই অদ্ভুত তার জীবনদর্শন! তোমার-আমার সঙ্গে প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষুধাতৃষ্ণা, চাওয়া-পাওয়ায়, ক্ষুদ্রতা বা মহত্বে আপাতদৃষ্টিতে হয়তো তার অনেক মিল খুঁজে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু তুমি কি বলতে পারবে ঠিক কতখানি আগুনের তাপ দিয়ে ঠিক কোন্ সময়টিতে মৃতদেহের হাঁটুর কাছে লাঠি দিয়ে আস্তে একটা ঠোক্কর দিয়ে একটু মোচড়্ দিলেই শন্‌পাপ্‌ড়ির মত মুচ্‌মুচ্ করে তা ঘুরে যাবে! মাথার খুলি কখন শব্দ করে ফাট্‌বে! কোন্ শবের কোথায় কতখানি জলের সঞ্চয় আছে এবং পুড়্‌তে কতক্ষণ সময় লাগবে! ভাগবত একনজরে সবকিছুই বলে দেবে, ঘড়ি দেখে মিলিয়ে নিতে পারো। তবে কাঁটাছেঁড়া সেলাইকরা লাস্ সম্পর্কে ভাগবত একটি কথাও বলবে না। অপঘাতের মৃত্যু—বিষ-খাওয়া, গলায় দড়ি, গাড়ী-চাপা-পড়া, জলে-ডোবা কিংবা গত কবছরে যার সংখ্যাই সব চেয়ে বেশী, সেই চাক্কু-পাইপ্‌গান-বোমার আঘাতে উঠতি যোয়ান ছোকরা-মড়া, পোষ্টমর্টেমের টেবিলে ডাক্তারের ছুরি-কাঁচিতে ফালা ফালা—আলিবাবার গল্পের মত এইরকম সেলাইকরা মড়া দেখলেই ভাগবতের মেজাজ খারাপ হয়ে যায়, তখন বেশী করে 'চুল্লু' টেনে, ঘোৎ হয়ে কাজ করে যায়, হাজার চেষ্টা করলেও তখন সে একটি কথাও বলবে না। মড়া তো মড়াই, তার আবার জাত আছে নাকি! অথচ তখন তার কেন এমন পরিবর্তন হয়—হয়ত সে নিজেও জানে না!

ভাগবতের চেহারার সঙ্গে শিশুপাঠ্য বইয়ের 'শ্মশানে হরিশ্চন্দ্র' ছবির কোন মিল নেই। ছবির হরিশ্চন্দ্রের খালি গা, একমুখ দাড়ি গোঁফ, হাতে লাঠি, পাশে চিতার আগুন ও ভাঙ্গা হাঁড়ি-কলসী থাকলেও চেহারাটা দেখলে রাজা রাজাই মনে হয়, কারণ তাঁকে তো বেশীদিন ঐ পেশায় থাকতে হয়নি। কিন্তু ষোলটা বছর ধরে ভাগবত চিতার আগুনে পুড়ছে, হু হু করে জ্বলা চিতার চারফুট দূরত্বে দাঁড়িয়ে দিনেরাতে শবদেহ ঘাঁটাঘাঁটি করতে হচ্ছে। চোখ মুখ চুলে আগুনের তাপে মরচে-পড়া লোহার রঙ ধরেছে আর কঠিন হাড়ের উপর চামড়াব আবরণে ঢাকা একটা দেহ, যেন একটা 'শুক্‌নো স্থপুরীগাছের ছায়া'। চিতার কাছে না থাকলে, ঠিকমত নেড়েচেড়ে না দিলে চলবে কি করে, অপটু হাতে পড়ে লাস্‌ 'দরকোচা' মেরে যাবে, তিন ঘণ্টার মড়া পুড়বে সাত ঘণ্টায়, বেশীক্ষণ চিতা আট্‌কে থাকলে আর একজন মহাজনকে তিনটি দড়ির বাঁধনে খাটিয়ায় শুয়ে গঙ্গাপ্রাপ্তির অপেক্ষায় থাকতে হবে, সর্বোপরি গঙ্গাপুত্তুরের পাঁচটি টাকার লোকসান। তাই অভিজ্ঞ লোক, যেমন এই দলের ষষ্ঠীচরণ, ছাড়া যাকে তাকে ভাগবত আগুনের কাছে ঘেঁষতে দেয় না। নিজের হাতে চিতা সাজায়...উত্তরে মাথা দক্ষিণে পা, পুরুষ হলে চিৎ, স্ত্রীলোক মহাজনকে উপুড় করে ভাগবত নিজের হাতে শুইয়ে দেয়। মৃতের উত্তরাধিকের হাতে মুখাগ্নি ইত্যাদি আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম শেষ হলে চিতার কাঠের স্তূপের নীচে রবারের টায়ারে আগুন লাগায় নিজের হাতে, বহ্নিদেব ঝল্‌কে ওঠেন, শত শত কালনাগিনীর সিঁদূরে জিভ লক্‌লক্‌ করে মহাজনের পঞ্চ-ভূতের শরীর ঘিরে নেচে ওঠে। ভাগবত মড়া পোড়ায় নিজেও পোড়ে।

১৮ই ভাদ্র, সন ১৩২০ সাল, সকাল ৬-১৫ মিঃ গতে, 'মতিলাল ঘোষস্য নশ্বর অবয়বঃ সম্প্রদান কামনায়, অগ্নিদেব প্রার্থনায়, এতৎ আত্মা পরমাত্মায় বিলীন ভবতুঃ, ইদং স্বকল্যাণ কামনায়, প্রার্থনায়, পরমব্রহ্ম নিবেদনং ইতি—ওঁ গঙ্গা ওঁ গঙ্গা।' ভোরের হাওয়ায় গঙ্গার ঢেউ নাচে। ওপারে চটকলের চিম্‌নীর মাথায় একলাফে সূর্যটা চড়ে

বসে। এপারের 'নিমাইতীর্থে' আটাত্তর বছরের কৃতিপুরুষ, গোপালপুরের জনকল্যাণব্রতী শ্রদ্ধেয় মতিলাল ঘোষমশাই এর দেহ থেকে ফুলের স্তবক, পুরাতন বস্ত্রাদি মায় গলার হরিমালা পর্যন্ত খুলে নিয়ে 'সর্বমোহমুক্ত' করা হয়। শ্মশানের পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণ করে গঙ্গাজলে দেহশুদ্ধি করে নববস্ত্রে, ঘৃতচন্দনে সুশোভিত করেন। ওদিকে হঠাৎ একটা যান্ত্রিক শব্দ শোনা যায়। শ্মশানঘাটের পাশে বড় রাস্তায় একটা পুলিশের জিপ্ দাঁড়িয়ে পড়ে। ধরাচূড়াপরা একজন তরুণ পুলিস অফিসার লাফিয়ে নেমে প্রায় দৌড়ে শ্মশান চত্বরে ঢুকে পড়েন তারপর মৃতদেহের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হাউমাউ করে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। ইনি ঘোষকত্তার সেজছেলে, পোলবা পুলিশ স্টেশনের ও. সি.। লোকাল থানা মারফৎ ওয়ারলেসে খবর পেয়ে রাতের ডিউটি থেকেই ছুটে এসেছেন বাবাকে শেষদেখা ও শেষ প্রণামের বাসনা নিয়ে। অদূরে সঙ্গী সেপাইটা বিস্ময়ে বিমূঢ়; বাঘে-গরুতে একঘাটে জল না খেলেও থানার যে 'বড়হুজুরের' দাপটে পোলবা এলাকার লোকজন থরহরি কম্পমান, সেলাম ও সেলামী ছাড়া যিনি পথ চলেন না, সেই জাঁদরেল 'স্যার'কে এইরকম ছোটছেলের মত হাউমাউ করে কাঁদতে দেখে, এমতাবস্থায় করণীয় কি তা ভেবে না পেয়ে, সে 'এ্যাটেনসন্' হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। শ্মশানের 'ফটো-খিঁচ্নেওলা-বাবু' ফ্লাশগান্ লাগানো ক্যামেরা বাগিয়ে বিভিন্ন এ্যাঙ্গেল্ থেকে ঘোষকত্তার শেষ ছবি তুলে নেয় এবং শববাহক্ দলের গ্রুপ-ফটো তোলার সময় পাড়ার ছেলেছোকরারা বিভিন্ন 'পোজ' নিয়ে দাঁড়িয়ে যায়।

এদিকে ভাগবতও প্রস্তুত। ইতিমধ্যে একফাঁকে সে ষষ্ঠীচরণকে সঙ্গে নিয়ে বংশীর মালের দোকানে গিয়ে জামাইবাবুর দেওয়া দুটি টাকার সদ্ব্যবহার করে এসেছে। গতরাতের 'খোঁয়াড়ী' কেটে গিয়ে শরীরটা বেশ চন্‌মনে হয়েছে, মনেও বেশ স্ফূর্তি……দিনের শুরুটা ভালই! ঘোষকত্তার জন্যে সাজানো চিতার পাশে দাঁড়িয়ে ফোলাফোলা

চোখের ঘোলাটে দৃষ্টিতে কৌতুক ঝরিয়ে সে চামেলীকে দ্যাখে, এই মুহূর্তে মনে হয় তার বিবিটা সত্যিই কাজের এবং 'বহুত্ খাপ্সুরৎ'। বিঘাখানেকের মত প্রশস্ত এই চত্বরটুকু প্রতিদিন ভোরে ঝাঁটা দিয়ে পরিষ্কার করার দায়ীত্ব চামেলীর। কাজের ফাঁকে একসময় তার নজর পড়ে ভাগবতের কুংকুতে চোখের দিকে, হাতের ঝাঁটা থামিয়ে সে আড়চোখে আর একবার তার 'স্বামী' নামক জীবটির শুক্নো সুপুরী-গাছের ছায়ার মত দেহটির বর্তমান পরিস্থিতিটুকু বুঝে নিয়ে পুনরায় ঝাড়ু চালায়, মুখে বিড়বিড় করে 'মুর্দা কাঁহিকা, সবেরেই পি লিয়া, হায় রাম।' আসলে চামেলীর রাগবিরক্তির কারণ ভাগবতের সাম্প্রতিক শারীরিক অসুস্থতা। অসহ্য পেটের ব্যথায় যখন এক এক সময় সে কাটাছাগলের মত ছট্ফট্ করে তখন চামেলী ভীষণ ভয় পেয়ে যায়— এই বুঝি মানুষটা সত্যিই 'মুর্দা' হয়ে যায়, সে কষ্ট চোখে দেখা যায় না। দীর্ঘদিন চিতার আগুনের তাপে, অনিয়মে আর দেশীমদের তরল আগুনে মানুষটার দেহে ক্ষয় শুরু হয়ে গেছে। একদিন এমনি এক যন্ত্রণার সময় ভাগবতকে সাইকেল-রিক্সায় চাপিয়ে চামেলী মিউনিসি-প্যালেটির ডাক্তারবাবুর কাছে নিয়ে গিয়েছিল। দেখেশুনে তখনকার মত 'দাওয়াই' দিয়ে ডাক্তারবাবু তিনটি নির্দেশ দিয়েছিলেন ঃ আগুনের তাপে মড়াপোড়ান বন্ধ করে বিশ্রাম নিতে হবে, ভালমন্দ খেতে হবে আর মদ খাওয়া একদম বন্ধ করতে হবে—যার একটিও ভাগবতের পক্ষে মেনে চলা সম্ভব হয়নি। চামেলী ভাবে, প্রথম দুটি নির্দেশ নাহয় মেনে চলা সম্ভব নয় কেননা ডোমের কাজই মড়া পোড়ানো। আর আগুন ছাড়া কি মড়া পোড়ে! তাই আগুনের কাছে যেতেই হবে, আর ভালমন্দ খাওয়ার মত তাদের তেমন সঙ্গতি কোথায়? কিন্তু 'দারু' খাওয়াটা তো ছাড়তে পারে, পয়সাও বাঁচে শরীরটাও ভাল থাকে। অথচ শরীর ভাল থাকলে ভাগবত হেসে বলে "আরে পাগলী, তু কেইসে জানেগী, ইয়ে দারু তো হাম্কো জিন্দা রাখত্যা হ্যায়।" তিনটি ছেলেমেয়ের অভিভাবক লোকটার এইরকম কথা আর হাসিতে

চামেলী রাগে, বিরক্তিতে ও হতাশায় কপাল চাপড়ায় 'হ্যায় রাম' তার মনে হয় লোকটা বুঝি সত্যিই একটা 'জীবন্ত মড়া'।

'বলহরি হরিবোল'—১৮ই ভাদ্র, ১৩২০। নিমাইতীর্থের ১নং চিতার আগুন জ্বলে উঠতেই আবার শোনা গেল সেই পরিচিত সমবেত কণ্ঠস্বর। ভাগবতের এগারো বছরের ছেলে বনোয়ারী খবর নিয়ে দৌড়ে এল, নতুন এক মহাজন···আর একদল শববাহক্ এসে পড়েছে। ভাগবত খুশীতে বিড়বিড় করল 'গঙ্গা মায়িকী জয়'। তারপর আবার অফিস ঘর, জাব্দাখাতা, ক্যাসবাক্স, ঘৃত-রম্ভা-আতপ চাউল-তিল তুলসী ইত্যাদি। ভাণ্ডারহাটীর উনষাট্ বছরের নির্ঝঞ্ঝাট্ বিধবা উমাশশী দেবী, ওজন সাঁইত্রিশ কে. জি., পনেরো বিঘা শালিজমির সম্পত্তি-বতী। একমাত্র ভাইপো ছাড়া তিনকুলে কেউ নেই। ছালছাড়ানো মুরগীর মত এতটুকু শরীরে প্রচণ্ড প্রতাপ, বাড়ীতে কাকচিল্ বসতে পারে না, পাড়ার লোকের কাছে বিশেষ পরিচিতি 'শুট্‌কীপিসী,' ভীষণ শুচীবায়ুগ্রস্তা। শুদ্দুরের ছায়া মাড়ালে গোবরজল ছড়ানো, স্নান ও বস্ত্র পরিবর্তন এমনকি গরমকালে পুকুরডোবা শুকিয়ে গেলে গ্রামের 'ইতরজনেরা' শুটকীপিসীর উঠোনের টিউবওয়েল থেকে পানীয় জল নিলে যিনি গোবরজল দিয়ে টিউব্‌ওয়েলকে পর্যন্ত স্নান করাতে ছাড়েন না সেই 'শুটকীপিসী' ওরফে উমাশশী দেবী তাঁর পনেরো বিঘা ধানজমি, তিন কামরার একতলা পলেস্তরাখসা বাড়ী, একমাচা লাউগাছ এবং অনন্যসাধারণ শুচীবায়ুগ্রস্থতা ত্যাগ করে আজ এই নিমাইতীর্থের ২নং চিতায় আরোহণ করলেন। 'দুরাউণ্ড চুল্লু' চাপিয়ে ভাগবতের মেজাজ এখন শরিফ্, ষষ্ঠীচরণকে রসিকতা করে বলে যে এই পিসিমায়ীকে নিয়ে আসার জন্যে একটা বড়ো র‍্যাশন্ ব্যাগই যথেষ্ট, শুধু শুধু বাঁশের খাটুলি তৈরীর পরিশ্রম ওরা করলেই পারতো। ভাগবতের পিঠ চাপড়ে ষষ্ঠীচরণ আকাশ ফাটিয়ে হেসে ওঠে···তার এখন পাঁচ রাউণ্ড পার হয়ে গ্যাছে।

দু দুটো চিতা জ্বলছে। ভাগবতের এতটুকু ফুরসুত্ নেই। গামছাটা

মাথায় পাক্‌দিয়ে বাঁধা, হাতের লাঠির নিপুণ কারিগরী, অথচ এইসময় হঠাৎ তার পেটের মধ্যে সেই পরিচিত যন্ত্রণার মোচড়···সেই কাটা-ছাগলের দাপাদাপি। ভাগবত দাঁতেদাঁত চেপে ঘোষকত্তার একটা পা মুচড়ে চিতার আগুনে ঘুরিয়ে দেয়। 'কাজের টাইমে' এইরকম বেয়াদপি বরদাস্ত করা যায় নাকি! তাই শ্মশানচত্বরের এককোনে পোড়াকাঠের স্তুপের মধ্যে লুকোনো বোতলের তরল আগুনের নির্জলা একচুমুক্‌···কাটাছাগলের দাপাদাপির বেয়াদপিকে একথাপ্পড়ে থামিয়ে দেয় ভগবত। দূরের বটগাছের ছায়ায় বসে ষষ্ঠীচরণ নেশার ঝোঁকে হাঁক দেয় 'বহুত আচ্ছা ভাই, চালিয়ে যাও।' ভাগবত বুঝতে পারে আজ ষষ্ঠীদার নেশার 'ডোজ' বেশী হয়ে গ্যাছে, সুতরাং তার কাছ থেকে সহযোগীতায় তেমন ভরসা নেই, তাকে আজ একাই কাজ চালাতে হবে।

'বলহরি হরিবোল'···১৮ই ভাদ্র, ১৩২০, সকাল সাড়ে দশটা। মা গঙ্গার একি খাম্‌খেয়াল! চামেলী খুশীতে ডগমগ, নিমাইতীর্থের ৩নং চিতাতেও আগুন জ্বলে উঠলো। বছর কয়েকের মধ্যে এমনটি দেখা যায়নি। একবেলাতেই 'মহাজনদের আগমনে নিমাইতীর্থের 'মহাস্থান' আগুনে-ধোঁয়ায় জমজমাট। একনম্বরের মামলাবাজ, সুদখোর ও মহালম্পট্‌ ভক্তিভূষণ ভদ্রের মরদেহ নিয়ে মনোহরপুরের বারোজনের এই দলটির এগারো জনই ভাড়াটিয়া শবানুগামী, মদে চুরচুর। জীবিতকালের ক্রিয়াকর্মে ভক্তিভূষণের প্রতি দেশের লোকের ভক্তির ছিটেফোঁটাও ছিল না। তাই মৃত ভক্তিভূষণের সৎকারের জন্যে লোক পাওয়া যায়নি। ভক্তিভূষণের হতভাগ্য একমাত্র পুত্র ফকিরচন্দ্রকে, মাথাপিছু পাঁচটাকা, পেটভর্তি খাওয়াদাওয়া এবং এগারো বোতল 'কালিমার্কার' কনট্রাক্টে এই এগারোজনকে যোগাড় করতে হয়েছে, যারা এই মুহূর্তে এক ভীষণ প্রশ্নের সম্মুখীন, প্রচণ্ড তর্কাতর্কি ···'বাবা বড় না কাকা বড়!' একজন জড়িতকণ্ঠে,

আমি বলছি, মাইরি, বাবা বড়।

অন্যজন ঃ ধ্যুস্, তুই শালা ঘোড়ার ডিম জানিস। আমি বলছি কাকা বড়। পাঁচজনকে জিজ্ঞাসা করে দেখ। ঐতো গঙ্গাপুত্তুরকেই ডাক না।

দুটোদলে ওরা ভাগ হয়ে একটা মারদাঙ্গা শুরু করে দেয় আর কি! শেষ পর্যন্ত ভাগবত ওদের সমস্যাটার সমাধান করে দেয়। অর্থাৎ 'কাকাই বড়ো, তবে বাবা তার থেকে একটু বড়ো।' তখন দুপক্ষই খুশী। মালের মুখে এমন কথার মারপ্যাঁচ ধরে ফেলা যার তার কম্ম নয়! সুতরাং ৩নং চিতার আগুন জ্বলে, ভাগবতের পেটের মধ্যে 'কাটাছাগলটা' আবার দাপাদাপি শুরু করে, আর একচুমুক্ 'আগুন' দিয়েও তাকে সামাল দেওয়া যায় না। যন্ত্রণাটা বেড়ে যায়, ভাগবতের মাথার মধ্যে একটা সরীসৃপ-অনুভূতি ঘুরে ফিরে বেড়ায়।

এদিকে স্নানখাওয়া সেরে ঘাটবাবু শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদ প্রমাণিক এসে পড়েছেন। অফিসঘরে বসে কাঁচি সিগারেট ধরিয়ে খাতাপত্তর দেখে ভাবছেন···ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ৪নং চিতাটাও 'এনগেজ' হয়ে গেলে সাম্প্রতিককালের একটা রেকর্ড হয়ে যাবে। আর ওদিকে রান্না চাপিয়ে একফাঁকে শ্মশানচত্বরে এসে চামেলী পরিশ্রান্ত ভাগবতের কাছে ফিস্‌ফিস্ করে তার মনের আশার কথা জানিয়ে গ্যাছে··· জানিয়ে গ্যাছে যে, তার মন বলছে আজ চারনম্বরেও মা গঙ্গার কৃপা হবে। চামেলীর মন বলছে, ঘাটবাবু ভাবছে···সবাই ভাবছে চার-নম্বরও আজ জ্বলবে। ঘোষকত্তা, শুট্‌কীপিসী, ভক্তিভূষণ···সকলেই কি চাইছেন ৪নং জ্বলুক! বোতলের শেষ তলানিটুকু গলায় ঢালতে গিয়ে ভাগবতের হাত কেঁপে যায়, পেটের ভেতর থেকে হুক্ করে একটা আওয়াজ বেরিয়ে আসে, মাথাটা ঘুরে যায়। হাতের আধপোড়া লাঠিটা ধরে ভাগবত দাঁড়াবার চেষ্টা করে, পারে না, লাঠিটা হাত থেকে খসে যায়, একটা কুণ্ডলীপাকানো আগুনের টুক্‌রো ভাগবতের পেটের ভেতর থেকে ধীরে ধীরে ঘাড়ের মধ্য দিয়ে মাথায় উঠে আসে। দুপুরের তাজা সূর্য আর তিনটে চিতার লক্‌লকে আগুনের আলোতেও

ভাগবতের চোখে নেমে আসে একরাশ জমাট অন্ধকার। ফট্ করে একটা মড়ার খুলি ফাটার শব্দ হয়। দুটো জ্বলন্ত চিতার মাঝে সাড়ে পাঁচহাত ফাঁকের একফালি জমিতে শুক্‌নো সুপুরীগাছের ছায়াটা হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়ে।

'বলহরি হরিবোল' ১৮ই ভাদ্র, ১৩২০, আজ মা গঙ্গা নির্দয়ভাবে চামেলীকে কৃপা করেছেন···নিমাইতীর্থের ৪নং চিতাও জ্বলে উঠেছে। জাব্দাখাতার ৩২১ পৃষ্ঠার ক্রমিক নং ৬৪২১এর বিবরণ লেখা শেষ হয়েছে। মন্তব্যের কলমে ঘাটবাবু নিজের হাতে লিখে দিয়েছেন এক বিশেষ পরিচিতি···'নিমাইতীর্থের গঙ্গাপুত্র।'

শেষ